কৃষিশিক্ষা

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ মূলত কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর দেশ। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার, অধিক ফসল ফলনের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং কৃষি বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কৌশলের সাথে পরিচিত করার প্রয়াস নিয়ে **কৃষিশিক্ষা** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদেরকে কৃষির তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক উভয় দিকেই দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের কৃষি ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এই শিল্পায়নের যুগেও বাংলাদেশ কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক কৃষির সাথে তুলনা করলে অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশ যেমন কৃষিপ্রধান দেশ আর আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি তবুও ধান উৎপাদনে আমরা ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ হতে অনেক পিছিয়ে আছি। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে যাচ্ছেন। একসময় বাংলাদেশে বিশ্বের ৭৫ ভাগ পাট উৎপাদন হতো। কিন্তু ধানের চাহিদা ও কৃত্রিম আঁশের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার কারণে পাটের উৎপাদন কৃষকরা কমিয়ে দিয়েছেন। তবুও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে পাট অনেক অবদান রাখছে। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

বাংলাদেশের বাজারে শুধু যে বাংলাদেশের পণ্যই পাওয়া যায় তা নয়, প্রতিবেশী দেশের পণ্যও বাজারে প্রবেশ করেছে। এতে বাংলাদেশের সাথে অন্য দেশের একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের কৃষির অবস্থা এ অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চিত্র : কৃষিবিষয়ক গবেষণাগার

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- কৃষিতে বিজ্ঞানীদের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আধুনিক কৃষি ফলন এবং আমাদের জীবনধারার পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব।
- বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের কয়েকটি নির্বাচিত দেশের কৃষির অগ্রগতির সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের কৃষির সাথে কয়েকটি নির্বাচিত দেশের কৃষির তুলনা করতে পারব।

পাঠ- ১ : কৃষিতে বিজ্ঞানীদের অবদান

কৃষিতে বিজ্ঞানীদের অবদান অনেক। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় কৃষির সাথে যুক্ত করে কৃষি কর্মকাণ্ডকে আধুনিকায়ন করেছেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা যেমন বিজ্ঞানী হতে পারেন, তেমনি কৃষকরাও বিজ্ঞানী হতে পারেন। আদি কৃষির উৎপত্তি সাধারণ মানুষের হাতেই। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা জলবায়ু, পরিবেশ, মাটি, পানি, উৎপাদন পদ্ধতি এসব বিষয় বিবেচনায় এনে উচ্চতর গবেষণা করছেন। তাদের নিরলস গবেষণার ফলে কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি।

বাংলাদেশের কৃষির সমস্যাগুলো দৃষ্টিগোচরে আনা জরুরি। ফসল উৎপাদনে এ দেশের প্রধান সমস্যাগুলো হচ্ছে-

- মাটির পুষ্টি উপাদানের সমস্যা
- সার ব্যবস্থাপনা সমস্যা
- বন্যা ও খরা সমস্যা
- লবণাক্ততা সমস্যা

উপর্যুক্ত সমস্যাবলি সমাধানে বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছেন। সারাদেশে মাটিতে উদ্ভিদের পুষ্টি সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা দেশকে ত্রিশটি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করেছেন। কোন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের মাটি কিরূপ এসব বিষয় উদ্ভাবন কৃষিবিজ্ঞানীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এসব অঞ্চলের মাটির ধরন বিবেচনা করে ফসল ফলানোর জন্য কোন ফসলে কী মাত্রায় সার প্রয়োগ করা হবে সে বিষয়ে কৃষকগণকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। তেমনিভাবে সার ব্যবস্থাপনায় সুন্দর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পূর্ববর্তী ফসলে যে মাত্রায় সার দেওয়া হয়েছে, তা বিবেচনা করে পরবর্তী ফসলের জন্য সারের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। কেননা কোনো কোনো সার নিঃশেষ হয়ে যায় না।

বন্যা, খরা, লবণাক্ততা বাংলাদেশের প্রধান কৃষি সমস্যা। এ সমস্যা দূরীকরণের জন্য বিজ্ঞানীরা বেশ অগ্রসর হয়েছেন। যেমন- বন্যার শেষে ধান চাষের জন্য বিলম্ব জাত হিসেবে ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট ব্রিধান২২ ব্রি ধান২৩ ব্রি ধান-৩৭ এবং ব্রি ধান-৩৮ নামে চারটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এ ছাড়া বন্যাকবলিত এলাকার জন্য ব্রি ধান-১১, ব্রি ধান-১২, ব্রি ধান-৫১, ব্রি ধান-৫২ ও ব্রি ধান-৭৯ নামের আরও পাঁচটি জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে। এই পাঁচ জাতের ধান পানির নিচে ১০-১৫ দিন টিকে থাকতে পারে। কৃষিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

বন্যা যেমন কৃষকদের একটি বড়ো সমস্যা, খরা ও লবণাক্ততা আরও বড়ো সমস্যা। এজন্য বিজ্ঞানীরা ব্রিধান৫৬ ব্রি ধান৫৭ নামের খরা সহনশীল ধান উদ্ভাবন করেছেন। উপকূল অঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে চাষের জন্য ব্রি ধান-৪০, ব্রি ধান-৪১, ব্রি ধান-৪৬, ব্রি ধান-৪৭, ব্রি ধান-৫৩, ব্রি ধান-৫৪ ও ব্রি ধান-৫৫ উদ্ভাবন হয়েছে।

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কৃষকেরা নতুন বিষয় আবিষ্কার করে কৃষিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। যেমন-ঝিনাইদহের হরিপদ কাপালি হরিধান নামে একটি ধান নির্বাচন করেছেন। কিছু কিছু উদ্ভিদের বিশেষ অঙ্গ বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ধরনের বীজ থেকে উৎপন্ন গাছে মাতৃগাছের সকল গুণাগুণ হুবহু পাওয়া যায়। ফুলের পরাগায়ণের সময় উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজে পিতৃগাছের গুণাগুণ যুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে কিন্তু অঙ্গজ প্রজননে সে আশঙ্কা থাকে না। কৃষকগণ কলা, আম, লিচু, কমলা, গোলাপ, চা, ইক্ষু, লেবু ইত্যাদির উৎপাদনে অঙ্গজ প্রজনন ব্যবহার করে থাকেন। ফসলের বীজ ও নতুন নতুন জাত উন্নয়ন, বীজ সংরক্ষণ, রোগ বালাইয়ের কারণ শনাক্তকরণ, ফসলের পুষ্টিমান বাড়ানো- এ সকল কাজই কৃষিবিজ্ঞানীরা করে থাকেন। এমনকি ফসল সংগ্রহের পর বিপণন পর্যন্ত ফসলের নিরাপত্তা বিধান ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখার যাবতীয় প্রযুক্তি কৃষি ও অন্যান্য বিজ্ঞানী গবেষণার মাধ্যমে সম্পন্ন করেন।

কৃষির সঙ্গে বিজ্ঞানের নানা শাখার কর্মকাণ্ড জড়িত। কৃষিতত্ত্ব ছাড়াও মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন ইত্যাদি শাখার বিজ্ঞানীরা তথ্য ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে অবদান রাখছেন। পশুপাখি পালন ও এদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অপর একদল বিজ্ঞানী ক্রমাগত কাজ করছেন। মৎস্য লালন পালন, প্রজনন, উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রেও একদল বিজ্ঞানী অবদান রাখছেন। এই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশেও বিভিন্ন গবেষণা ইন্সটিটিউট রয়েছে। এসব ইন্সটিটিউট ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে একজন কৃষিবিজ্ঞানী ও তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করে পোস্টারে লিখবে এবং উপস্থাপন করবে।

পাঠ- ২ : বাংলাদেশের মানুষের জীবন, সংস্কৃতি এবং কৃষির আধুনিকায়ন

বাংলাদেশের মানুষের জীবন, সংস্কৃতি এবং কৃষি এক সুতোয় গাঁথা। প্রাচীনকাল থেকে কৃষিই ছিল এ দেশের মানুষের অন্যতম অবলম্বন। সময়ের ধারাবাহিকতায় সেই প্রাচীন কৃষিতে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষি উৎপাদনে বয়ে আনছে ব্যাপক সাফল্য। অথচ কৃষিপ্রধান এই দেশে এক সময় অভাব-অনটন লেগেই ছিল। এ ছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সংঘটিত দুর্ভিক্ষ সমগ্র বাংলাদেশকে গ্রাস করেছিল। জাপানি সেনাদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে ব্রিটিশ সরকার বাংলা ও আসামের খাদ্যগুদামের খাদ্যশস্য হয় পশ্চিমে স্থানান্তর করেছিল, নয় ধ্বংস করেছিল। ব্রিটিশ দুর্ভিক্ষে শুধু পূর্ববাংলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়। মহাযুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়লেও ঐ সময় ব্রিটিশ সরকার একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেয়। আসাম ও বাংলার জন্য ঢাকার শেরে বাংলা নগরে একটি কৃষি ইন্সটিটিউট, কুমিল্লায় একটি ভেটেরিনারি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খুলে ডিগ্রি পর্যায়ে কৃষিশিক্ষা চালুর ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি কৃষিবিভাগ নামে একটি বিশেষায়িত দপ্তর চালু করা হয়। এতে তাৎক্ষণিকভাবে দুর্ভিক্ষাবস্থার উন্নতি না হলেও বাংলাদেশের কৃষির আধুনিকায়নের যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৬১ সালে ময়মনসিংহে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিতি লাভ করে। এদের নির্দেশনায় তৃণমুল পর্যায়ে কাজ করার জন্য দক্ষ মাঠকর্মী তৈরি করতে কিছু কৃষি সম্প্রসারণ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (Agricultural Extention Training Institute) ও পশু চিকিৎসা ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (Veterinary Training Institute) স্থাপন করা হয়। প্রায় প্রতিটি জেলায় সরকারি কৃষি ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্ম এবং কোথাও কোথাও ডেইরি ফার্ম চালু হয় প্রদর্শনী খামার হিসেবে। পাট, আখ, চা ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের বিষয়ে গবেষণার জন্য একক গবেষণা ইন্সটিটিউট যথাক্রমে ঢাকা, ঈশ্বরদী ও শ্রীমঙ্গলে স্থাপিত হয়। গাজীপুরে কৃষি গবেষণা ও ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়।

এই সকল আয়োজনের ফলে পূর্ববাংলায় কৃষির আধুনিকায়ন শুরু হয় উনিশ শতকের ষাটের দশকে। প্রধান কৃষি ফসল ধানের ক্ষেত্রে এর প্রভাব সব চেয়ে বেশি দেখা যায়। বিভিন্ন স্বাদগন্ধের কম ফলনশীল স্থানীয় ধানের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল ইরি, ব্রি ধানের চাষ শুরু করা হয়। এগুলো চাষের জন্য সার, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির চাহিদা কৃষিতে বাড়তে থাকে। ফলে প্রতি একর জমিতে উৎপাদন ব্যয় ক্রমাগত বাড়তে থাকে। তবে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে ফলনও বৃদ্ধি পায় কিন্তু উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় দরিদ্র কৃষকেরা হয় ক্ষেতমজুরে পরিণত হন, না হয় ভিটেমাটি ছেড়ে শহরে পাড়ি জমান নতুন পেশার খোঁজে। এ সময় উন্নত জাতের মুরগি, হাঁস ও গরুর খামার কিছু মানুষের কর্মসংস্থান করে দেয়। পরিবহন ও বিপণনের সুবিধার জন্য দেশের শহরগুলো ঘিরে আধুনিক মুরগির খামার দিন দিন বেড়ে চলেছে।

কৃষিতে বিভিন্ন ফসলের উচ্চতর ফলন, পশুজাত দ্রব্যাদি যেমন- ডিম, দুধ, মাংস ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি হয় ও গ্রামীণ জীবনে শিক্ষার বিস্তার ঘটে।

মাটি বা জমি কৃষির মুল ক্ষেত্র। এই মাটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নেই। মাটির গঠন, প্রকারভেদ, উর্বরতা, মাটিতে বসবাসকারী অণুজীব ও এদের উপকারিতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ফসল উদ্ভিদ, গবাদি পশুপাখি, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর পুষ্টি, বৃদ্ধি, প্রজনন, নিরাময় ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে এই বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো কৃষকরা গ্রহণ করেছেন। ফলে স্বাস্থ্যসম্মত সুষম খাদ্য উৎপাদনে কৃষির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। উচ্চ ফলনশীল ধান, গম, ভুট্টা, যব এই সব শস্যের উৎপাদনশীলতা আগের তুলনায় অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে আটটি পুর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি পূর্ণাঙ্গ ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিম্যাল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে। নতুন স্থাপিত হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শীঘ্রই চালু হওয়ায় পথে। প্রায় সকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান পড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষকগণ গবেষণা করে থাকেন। তাদের গবেষণায় প্রাপ্ত উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীরা কৃষকদেরকে অবহিত করেন। ফলে দেশের কৃষি উৎপাদনে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। নিয়ম কানুন মেনে চাষ করলে প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাতের চেয়েও এরা বেশি ফলন দেয়। বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের হাইব্রিড উদ্ভাবন করেছেন।

বিজ্ঞানীগণ নানা ধরনের ফুল, ফল, শাকসবজি, মুরগি, গরু, মাছ ও বৃক্ষ বিদেশ থেকে এনে এদেশের কৃষিতে সংযোজন করেছেন। এগুলোর সাথে সংকরায়ণ করে দেশীয় পরিবেশ সহনীয় নতুন জাত উদ্ভাবন করছেন, যেগুলো এ দেশের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কৃষি উৎপাদনের এই অগ্রগতি গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনেছে। কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েছে। উৎপাদন বৈচিত্র্য বেড়েছে, সেই সাথে প্রতিযোগিতাও বেড়েছে। একই সাথে বেড়েছে পুঁজির ব্যবহার। মাছ, মুরগি ও ডিম উৎপাদন প্রায় শিল্পের পর্যায়ে পৌছে গেছে। শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের চাহিদা গ্রামীণ জনজীবনে দ্রুতই বেড়ে চলেছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন আমাদের জীবনধারার কী পরিবর্তন এনেছে তা ব্যক্ত করবে।

পাঠ-৩ : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কৃষির অগ্রগতি

আজকাল বিশ্বের দেশগুলোকে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ভাগ করা হয়। এই দেশগুলোকেই আবার শিল্পোন্নত ও কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে পরিচিত করা হয়।

শিল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিতেও উন্নত। এ সকল দেশ তাদের কৃষিকে উন্নত করে শিল্পে পরিণত করেছে। অপরদিকে 'কৃষিনির্ভর' দেশের সরকার বা কৃষক সমাজ শুধু অর্থনৈতিক কারণে উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি আত্মস্থ ও ব্যবহার করতে পারছে না। আসল কথা হচ্ছে আজ অনুন্নত দেশগুলো কৃষিতে অনুন্নত এবং উন্নত দেশগুলো কৃষিতেও উন্নত।

স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষির অগ্রগতি : স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রাকালে দেশে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি কৃষি কলেজ, একটি ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও কয়েকটি কৃষি সম্প্রসারণ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA), ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC), ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI), ১৯৭২ সালে তুলা উন্নয়ন বোর্ড (CDB), ১৯৭৪ সালে ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (SRI), ১৯৭৩ সালে মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন (FDC) সহ কৃষি বিষয়ক অনেক নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI), ১৯৮৫ সালে কৃষি তথ্য সার্ভিস (AIS), ১৯৮৬ সালে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (SCA), ১৯৯৬ সালে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (NARS) ও ২০০৭ সালে 'Krishi Gobeshona Foundation' স্থাপিত হয়। কৃষি ব্যবস্থাপনা ও গবেষণার উন্নয়নকল্পে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে যথাক্রমে 'Integrated Pest Management (IPM)' ও 'National Agricultural Technology Programme (NATP)' উল্লেখযোগ্য। কৃষিকে অধিকতর পরিবেশবান্ধব করার জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) সহ উত্তম কৃষি কার্যক্রমে কৃষকগণকে উৎসাহিত ও দক্ষ করে তোলার জন্য বিবিধ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ধানের ১১৫টি জাত এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়। ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতালগ্নের তুলনায় প্রায় ৩০% কম আবাদী জমিতে তখনকার চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি জনসংখ্যার বাংলাদেশ আজ উদ্বৃত্ত প্রধান খাদ্য (ধান) উৎপাদনে সক্ষম। কৃষিশিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে বর্তমানে আটটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিম্যাল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে। এর পাশাপাশি প্রায় সকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও পশুপালন অনুষদ চালু আছে। বর্তমানে সকল কৃষি ফসলের জন্য বিশেষায়িত গবেষণাগার রয়েছে। প্রতি বছর শহর ও গ্রামাঞ্চলে কৃষিমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কৃত্রিম রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য সবুজ সার এবং কম্পোস্ট সার তৈরি ও ক্ষেতে প্রয়োগ, কেঁচোজাত সার বা ভার্মিকম্পোস্ট প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রযুক্তি কৃষকদের হাতে পৌঁছানো হচ্ছে। গবাদি পশুর খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য উন্নত গোখাদ্য উৎপাদন, ঘাস

প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পোল্ট্রি ও মৎস্যখাদ্য তৈরিতে এখন বিপুল অগ্রগতি হয়েছে। দেশে পোল্ট্রি একটি কৃষিশিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বাজারে মাছের একটা বড়ো অংশ এখন আসছে চাষকৃত মাছ থেকে। প্রতি বছর বৃক্ষরোপণ সরকারিভাবে উৎসাহিত করায় কৃষি বনায়ন ও সামাজিক বনায়নের দিকে কৃষকরা আকৃষ্ট হচ্ছেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়েছে। বায়োটেকনোলজি বা জীবকৌশল বিজ্ঞানে অগ্রগতি বাংলাদেশের কৃষিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশি বিজ্ঞানী কর্তৃক পাটের জেনেটিক ম্যাপ আবিষ্কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, অর্থাৎ বাংলাদেশে কৃষির আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে।

পাটের জিনোম আবিষ্কারক ড. মাকসুদুল আলম

ভারতের কৃষি : ভারত একটি বৃহৎ ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের দেশ। ভারতের কিছু মরু অঞ্চল ছাড়া সমগ্র পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলই কৃষিপ্রধান। কৃষি পরিবেশেও দেশটি বৈচিত্র্যময়। ফলে শস্য, ফুল, ফল, সবজি, মাংস, দুধ, ডিম এমন কোনো কৃষিজ পণ্য প্রায় নেই যা ভারতে উৎপন্ন হয় না কিংবা বাজারে পাওয়া যায় না। ভারতের কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শুধু ভারতের কৃষিব্যবস্থার কাজে লাগছে না, বিশ্বও উপকৃত হচ্ছে। ভারতীয় কৃষিজপণ্যের অন্যতম আমদানিকারক দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ।

চীনের কৃষি : পরিকল্পিত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সুবিধাগুলো চীনের কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার দেশ হলেও চীনে খাদ্যঘাটতির কথা শোনা যায় না। প্রতি হেক্টরে সর্বোচ্চ পরিমাণ ধান, গম, ভুট্টা উৎপাদনের ক্ষমতা চীনা কৃষক ও বিজ্ঞানীদের কব্জায় রয়েছে। হাইব্রিড ধান বীজের জনক চীন। এখন পর্যন্ত চীন থেকেই সবচেয়ে বেশি হাইব্রিড ধান বীজ আমাদের দেশে আমদানি হয়। চীনা প্রযুক্তি শেখা ও আমাদের মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

ভিয়েতনামের কৃষি : ভিয়েতনামের অগ্রগতিতে তাদের কৃষকসমাজ ও কৃষির অবদান বিরাট। বিশেষ করে বিশ্বের অন্যতম প্রধান চাল রপ্তানিকারক দেশ আজ ভিয়েতনাম। কৃষিপ্রযুক্তি বিকাশে গত কয়েক বছরে এদের সাফল্য বিস্ময়কর। ওদের কাছে আমাদের শেখার রয়েছে অনেক।

কৃষির উন্নয়নের বিষয়টি দেশ বা অঞ্চলের সীমানা ছাড়িয়ে আজ আন্তর্জাতিক বা বৈশ্বিক গুরুত্ব লাভ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে যে প্রতিষ্ঠান বিশ্বজুড়ে কাজ করে তার নাম "খাদ্য ও কৃষি সংগঠন" (Food and Agriculture Organization, FAO)। এ ছাড়াও রয়েছে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের (International Rice Research Institute, IRRI, Phillipines) মতো বিশেষ ফসলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ। আমাদের দেশের কৃষি উন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

কাজ

১. শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসাবে বাংলাদেশের কৃষির অগ্রগতি সম্পর্কে একটি অনুচেছদ খাতায় লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

২. কৃষির আধুনিকায়ন মানুষের জীবনযাত্রায় কীভাবে প্রভাব ফেলছে তার একটি বর্ণনা লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ-৪ : এশীয় ও বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষির তুলনা

বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও ভিয়েতনাম এই চারটি দেশ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। এই দেশগুলোর মধ্যে ভৌগোলিক দিক থেকে যেমন কিছু সাদৃশ্য আছে তেমনি কিছু বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। এই চারটি দেশের প্রধান কৃষি উৎপাদন হচ্ছে ধান এবং এর জনগণ প্রধানত ভাত খেতে অভ্যস্ত। এদের মধ্যে চীন, ভারত ও বাংলাদেশ অত্যন্ত জনবহুল দেশ। অবশ্য ভিয়েতনাম ততটা নয়।

বাংলাদেশ ও চীন

বাংলাদেশের তুলনায় চীন কৃষিতে অনেক উন্নত। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে চীন বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে আছে। ধানের বংশগতির পরিবর্তন এমনভাবে ঘটাতে সক্ষম হয়েছে যে চীনের অধিকাংশ ধানের জাত আর মৌসুম নির্ভরশীল নেই। এই জাতগুলো পূর্বের প্রচলিত জাতগুলোর চেয়ে হেক্টর প্রতি সাতগুণ পর্যন্ত ফলন দিচ্ছে। চীনের ধান গবেষকগণ দাবি করছেন আগামী প্রজন্মের ধান জাতগুলো এখনকার চাইতে দ্বিগুণ উৎপাদন দেবে। এই 'সুপার হাইব্রিড' ধানের একটি বড়ো ধরনের অসুবিধা হলো এই সকল অত্যাধুনিক ধানের বীজ সংরক্ষণ করা যায় না। এক প্রজন্মেই বীজের গুণাগুণ শেষ হয়ে যায়। চীনের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে এই সব ফসল হয়ত সহায়ক। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। কারণ ঐতিহ্যগতভাবে ধান বীজের জন্য বাংলাদেশের চাষিদের বীজ ব্যবসায়ীদের মুখাপেক্ষী না হলেও চলে, কেননা দেশের মোট ব্যবহৃত ধান বীজের অন্তত ৮৫% চাষিরা নিজেরাই সংরক্ষণ ও ব্যবহার করে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) এ পর্যন্ত যতগুলো উচ্চ ফলনশীল ধান জাত High Yielding Variety (HYV) উদ্ভাবন করেছে সেগুলোর বীজ সঠিক মাঠব্যবস্থাপনায় নিজস্ব ধানক্ষেতেই উৎপাদন করা যায় এবং চাষিরা পরবর্তী ফসলের জন্য বীজ সেখান থেকে সংরক্ষণ করতে পারেন। অর্থাৎ ধান বীজের জন্য বাংলাদেশের চাষিদের এক ধরনের সার্বভৌমত্ব রয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট সুপার হাইব্রিড ধান উৎপাদনের জন্য জোর গবেষণা চালাচ্ছে। শীঘ্রই হয়ত বাংলাদেশের চাষিরা এই অতি উচ্চ ফলনশীল

দেশি ধান বীজ পাবে। তবে এই ধান উৎপাদনের অভিজ্ঞতা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশি চাষিরা রপ্ত করেছেন। কারণ কয়েকটি বীজ ব্যবসায়ী কোম্পানি এ ধরনের ধানের বীজ বাংলাদেশে চালু করতে আগ্রহী ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পরীক্ষামূলকভাবে সীমিত আকারে এ জাতীয় ধান উৎপাদনের অনুমতি দিয়েছিল এই শর্তে যে, কোম্পানিগুলো দেশেই এই ধান বীজ উৎপাদন করবে।

পাঠ- ৫ : বাংলাদেশ ও ভারত

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত। দুই দেশই জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির দ্বারা সমস্যাগ্রস্ত। এই বিপুল দ্রুত বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর ক্ষুধা নিবারণের গুরুভার দেশ দুই টির কৃষকসমাজের ওপর ন্যস্ত। ভারতের কৃষি বাংলাদেশের তুলনায় অনেক অগ্রসর। ধানসহ অন্যান্য শস্য, ডাল, ফুল, ফল, শাকসবজি, ভোজ্য তেলবীজ, তুলা, আখ, পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্যসহ প্রায় সকল কৃষিপণ্য উৎপাদনে ভারত বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে। ভারতে রয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ডেইরি সমবায় প্রতিষ্ঠান, যা বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ। এর প্রধান দুটি কারণের একটি হলো ভারতের কৃষক বাংলাদেশের কৃষকদের চেয়ে অনেক সংগঠিত; অপরটি হলো কৃষিবিজ্ঞান ও প্রকৌশলে ভারতের অভূতপূর্ব অগ্রগতি। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা শুধু ভারতের কৃষিকেই নয় বিশ্বের কৃষিকেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন।অবশ্য ভারতে কাজের ক্ষেত্রও বিশাল। বাংলাদেশের প্রায় আঠারো গুণ বড়ো এই দেশটিতে কৃষি পরিবেশের বৈচিত্র্য একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জ অপরদিকে ততোটাই সম্ভাবনাময়। মরু অঞ্চল থেকে শুরু করে বরফাবৃত অঞ্চল, নিচু জলাভূমি থেকে শুরু করে পার্বত্য অসমতল ভূমি, অনুর্বর খরাপ্রবণ এলাকা থেকে নদীবিধৌত উর্বর অঞ্চলও রয়েছে। দেশের এক অঞ্চলে যখন তুষারস্নাত শীতকাল অন্য অঞ্চলে তখন গ্রীষ্ম বা বসন্তকাল। ফলে ভারতের সর্বত্র প্রায় সব ধরনের ফসল সারা বছরই উৎপাদিত হচ্ছে।

এত কিছুর পরও উভয় দেশের প্রায় সকল ফসলের জমির ইউনিট প্রতি গড় উৎপাদন কাছাকাছি। আবার ভারতের কিছু কিছু রাজ্য রয়েছে যেমন- পাঞ্জাব, হরিয়ানা বা কেরালা যেখানে ইউনিট প্রতি উৎপাদন অনেক বেশি।

পাট, চামড়া, ইলিশ, চিংড়ি ইত্যাদি কিছু পণ্য ছাড়া প্রায় সব কৃষিপণ্য ভারত থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়।

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম

বাংলাদেশের ও ভিয়েতনামের কৃষিতে বেশি মিল ধান উৎপাদনে। তবে এক্ষেত্রে দৃশ্যত ভিয়েতনামের কৃষকদের অগ্রগতি বাংলাদেশের চেয়ে দ্রুত হয়েছে। পঁচিশ বৎসর আগে যেখানে ভিয়েতনামের কৃষি উৎপাদন অনগ্রসর ও দুর্বল ছিল, তারা প্রায় সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে গেছে। এই গতি

পাওয়ার প্রধানতম কারণ হলো ভিয়েতনামের কৃষকসমাজ অত্যন্ত সংগঠিত। ভিয়েতনামের কৃষি সমবায় সংগঠনগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও সৃজনশীল। সেখানকার সকল কৃষক কোনো না কোনো সমবায় সংগঠনের সাথে যুক্ত। কৃষি সমবায় সংগঠনগুলো এতো শক্তিশালী যে এরা স্থানীয় সরকারের বাৎসরিক ব্যয়ের অন্তত ৫০% জোগান দিয়ে থাকে। স্থানীয় কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তারা আর্থিক সহায়তা দেয়। এই সকল সংগঠন কৃষিনীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কৃষিতে ভিয়েতনাম থেকে বেশ কিছু মাঠপ্রযুক্তি গ্রহণ করেছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের কৃষির অগ্রগতির সাথে অন্য একটি এশীয় দেশের কৃষির অগ্রগতির তুলনামূলক আলোচনা পোস্টার পেপারে চার্ট আকারে লিখবে এবং উপস্থাপন করবে।

পাঠ- ৬ : ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা

ফসলের ক্ষেত্রে মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠার প্রধান কারণ হলো দিনের দৈর্ঘ্য সংবেদনশীলতা। এই দিবাদৈর্ঘ্য সংবেদনশীলতা দূর করতে বা কমিয়ে দিতে পারলে অর্থাৎ একটি মৌসুম নির্ভর ফসলকে মৌসুম নির্ভরতামুক্ত করতে পারলে ফসলটি যে কোনো মৌসুমে উৎপাদন করা যায়।

উপযোগিতা

১। বাজারে অসময়ের ফল ও সবজির চাহিদা খুবই বেশি। এসব অসময়ের ফসল উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়। কৃষক ও খুচরা বিক্রেতা উভয়ে বাড়তি পয়সা উপার্জন করতে পারে।

২। বিশেষ করে আগাম ফসল বাজারজাত করতে পারলে বেশি দাম পাওয়া যায়।

৩। ঋতুচক্র সংশ্লিষ্ট কর্মহীনতা দূর করে কৃষককে সারা বছর কর্মব্যস্ত রাখতে পারে।

৪। একই কারণে গ্রামীণ কর্মশক্তিকে সারা বছর কাজের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

৫। মঙ্গা বা এই ধরনের সাময়িক দুর্ভিক্ষাবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

৬। বাজারে কৃষিপণ্য বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে পারে।

৭। পুষ্টি সমস্যার সমাধান সহজতর করতে পারে।

৮। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে এনে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হতে পারে।

৯। বিদেশি ক্রেতাদের সারা বছর কৃষিপণ্যের লভ্যতার নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। ফলে কৃষিপণ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো যায়।

১০। কৃষি গবেষণাকে মৌসুম নির্ভরতামুক্ত করা যায়।

ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠার বিভিন্ন কৌশল

১। ফসল উৎপাদনের কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি : ফসলের উদ্ভিদতাত্ত্বিক গুণাগুণ পরিবর্তন না করেই এই কৌশলে যে কোনো ফসল উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে উন্মুক্ত মাঠে বা উদ্যানে না করে গ্রিনহাউসে কাঙ্ক্ষিত ফসল উৎপাদন করা হয়। অর্থাৎ বদ্ধঘরে কৃত্রিম উপায়ে পর্যাপ্ত আলো, উত্তাপ, বায়ুর
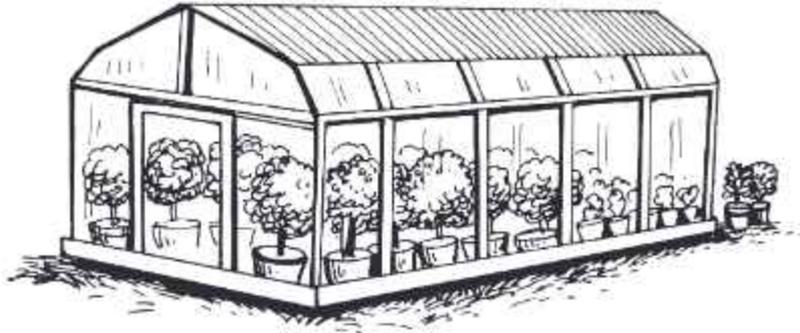
চিত্র : গ্রিনহাউস

আর্দ্রতাসহ পরিবেশগত যাবতীয় উপাদান সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি প্রত্যেক উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় সুষম পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়। এই কৌশল বাস্তবায়নের **প্রথম শর্ত হলো** - ফসলের পরিবেশ ও পুষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা। **দ্বিতীয় শর্ত হলো** - প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি ও পুষ্টি সরবরাহের যান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনা। **তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো** - নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ। এই পদ্ধতিতে যে কোনো ফসল উৎপাদন সম্ভব হলেও উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশি। বিশেষ বিশেষ ফসল ছাড়া এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না। এই কৌশলে কোনো ফসল বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করা যায় না। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা হওয়ায় এই পদ্ধতিতে ফসল হয় সম্পূর্ণ রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত।

আমাদের দেশে পরীক্ষামূলকভাবে এই পদ্ধতিতে ক্যাপসিকাম (মিষ্টি মরিচ), স্ট্রবেরি ও টমেটো উৎপাদন করা হয়েছে। বর্তমানে এই ফসলগুলোর বাজারমূল্য অনেক বেশি।

২। ফসলের জেনেটিক বা বংশগতির পরিবর্তন : ফসলের মৌসুম নির্ভরতা কাটিয়ে উঠার এবং তুলনামূলক স্বল্প খরচের পদ্ধতি হলো ফসলের বংশগতিতে পরিবর্তন আনা। ফসলের জিনগত বিন্যাস বদলানো, ফসলের দিবাদৈর্ঘ্য সংবেদনশীলতার জন্য দায়ী জিন ছাঁটাই করা অথবা এমন পরিবর্তন আনা যাতে তা প্রশমিত থাকে। সংকরায়ণ ও ক্রমাগত নির্বাচনের মাধ্যম ছাড়াও অন্য বেশ কিছু আধুনিক উপায়ে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। এই ধরনের ফসলকে জিএম ফসল বা

জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্রপ বলা হয়। এই বিশেষ কৌশলসমূহকে সাধারণভাবে বলা হয় জীবকৌশল বা বায়োটেকনোলজি।

৩। অভিজ্ঞ কৃষকের পর্যবেক্ষণ, চয়ন ও নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও মৌসুম নির্ভরতা এড়াতে সক্ষম এমন ফসল উদ্ভাবন করা যেতে পারে। এগুলো মাঠ পর্যায়ে টিকে গেলে নতুন জাত (ভ্যারাইটি/কালটিভার) হিসেবে স্বীকৃতিও পেতে পারে। কৃষক পর্যায়ের আবিষ্কৃত এই সব আগাম জাত, নাবি জাত মাঠ পর্যায়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে জনপ্রিয় কোনো কৃষিপণ্য বাজারে দীর্ঘসময় ধরে পাওয়া যায়। এই সকল কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় খুব বেশি না হওয়ায় কৃষকের মুনাফা বৃদ্ধিতে বেশ অবদান রাখতে পারে। ফসলের জাত উদ্ভাবনে মানবসৃষ্ট এটাই সবচেয়ে সনাতন পদ্ধতি।

কাজ : বাংলাদেশে গ্রিন হাউসে ফসল ফলানো কতটা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দেশের মোট ব্যবহৃত ধান বীজের শতকরা কত ভাগ চাষিরা নিজেরাই সংরক্ষণ ও ব্যবহার করেন?

ক. ৬৫% খ. ৭৫%

গ. ৮৫% ঘ. ৯৫%

২. **ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠা গেলে-**

i. বেকারত্ব দূর হবে

ii. পণ্যের দাম পাওয়া যাবে

iii. বিভিন্ন রকমের ফসল পাওয়া যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রওশন আরা তাহার বসত বাড়ির বাগানে কয়েকটি ফল গাছের কলম চারা ও শাকসবজির বীজ বপন করেন এবং ভালো ফলন পান। কিন্তু পরবর্তী বৎসর নিজের উৎপাদিত শাকসবজির বীজ থেকে সবজি চাষ করে ভালো ফলন পেলেন না।

৩. **রওশন আরার লাগানো ফল গাছগুলো কী ধরনের গুণসম্পন্ন হবে?**

ক. মাতৃগাছের মতো খ. পিতৃগাছের মতো

গ. মাতৃগাছ থেকে ভালো ঘ. মাতৃ ও পিতৃগাছের মতো

৪. **রওশন আরার পরবর্তী বছর সবজি চাষ করে ভালো ফলন না পাওয়ার কারণ?**

ক. নিজের বাগান থেকে বীজ সংগ্রহ খ. পরের বছর একই জমিতে সবজি চাষ

গ. মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকা ঘ. মাতৃ ও পিতৃগাছের গুণাগুণ একত্রে হওয়া

সৃজনশীল প্রশ্ন

১ কৃষিনির্ভর এনায়েতপুর গ্রামের চাষিরা মৌসুমভিত্তিক ফসল চাষ করেন। তাদের উঁচু জমিগুলো অনেক সময়ই খালি পড়ে থাকে। ফলে চাষিরা ঐ সময়ে বেকার বসে থাকেন। জমিতে ফসল না থাকা ও বেকারত্বের কারণে দিশেহারা কৃষকরা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ চাইলে কৃষি কর্মকর্তা চাষিদের মৌসুম নির্ভরতামুক্ত বিভিন্ন ফসলের জাত চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করেন। ধানসহ বিভিন্ন শাকসবজির মৌসুম নির্ভরতামুক্ত ফসল চাষ করে এনায়েতপুরের চাষিরা বর্তমানে স্বাবলম্বী।

ক. জি এম ফসল কী?

খ. সুপার হাইব্রিড ধানের চাষ চাষিদের বীজের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করে ব্যাখ্যা কর।

গ. ফসল চাষে সফলতা পেতে এনায়েতপুরের চাষিরা যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে এনায়েতপুরের চাষিরা কীভাবে স্বাবলম্বী হয়েছিল- বিশ্লেষণ কর।

২. কৃষক রফিক টেলিভিশনে ভিয়েতনামের কৃষির উপর একটি প্রতিবেদন দেখছিলেন। প্রতিবেদনে ভিয়েতনামের কৃষিতে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তি, চাষাবাদের ধরন ও চাষিদের কার্যক্রমের চিত্র দেখানো হয়। এক পর্যায়ে উপস্থাপক বললেন বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলো আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার করতে না পারার কারণে পিছিয়ে আছে। রফিক টেলিভিশনের অনুষ্ঠান থেকে ভিয়েতনামের চাষিদের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করে তার এলাকায় চাষিদের সংগঠিত করেন।

ক. কৃষি কী?

খ. আদি কৃষির উৎপত্তি সাধারণত মানুষের হাতেই- ব্যাখ্যা কর।

গ. রফিক কীভাবে তার এলাকার কৃষকদের সংগঠিত করেন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্রে উপস্থাপকের মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষি প্রযুক্তি

প্রযুক্তি উদ্ভাবন একটি চলমান প্রক্রিয়া। একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন হওয়ার পর এর ব্যবহার কিছুদিন চলে। পরে এর চেয়েও আরও উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়। মানুষ প্রয়োজন মোতাবেক এই উন্নত নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করে। যেমনঃ সার একটি রাসায়নিক প্রযুক্তি। দীর্ঘদিন মানুষ গাছকে পুষ্টি উপাদান সরবরাহের জন্য উন্নত সার ব্যবহার করে আসছে।এরূপ সব সময়ই নতুন প্রযুক্তি পুরাতন প্রযুক্তির স্থান দখল করে।

চিত্র : আখের সাথে আলু

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- কৃষিতে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শস্য পর্যায় ব্যাখ্যা করতে পারব।

কৃষিতে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার

পাঠ-১ : ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার

গুটি ইউরিয়ার পরিচয় : ধান চাষে অনেক সার ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে নাইট্রোজেন সম্বলিত ইউরিয়া প্রধান। দানাদার ইউরিয়া সারের সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য মেশিনের সাহায্যে এটাকে গুটি ইউরিয়ায় রূপান্তর করা হয়েছে।
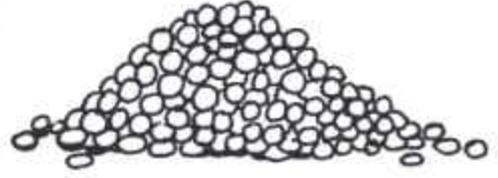
চিত্র : গুটি ইউরিয়া   চিত্র : দানাদার ইউরিয়া

গুটি ইউরিয়ার প্রয়োজনীয়তা

প্রচলিত দানাদার ইউরিয়া ব্যবহারের অসুবিধা থেকেই গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাই এখানে প্রথমে প্রচলিত দানাদার ইউরিয়ার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করা হলো। পরে গুটি ইউরিয়া সারের সুবিধা ও অসুবিধা তুলে ধরা হবে।

দানাদার ইউরিয়া ব্যবহারের সুবিধা

- এটি প্রয়োগ করা খুব সহজ।
- প্রয়োগে সময় ও শ্রম কম লাগে।
- গাছের মূল বা শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।
- বাজারে সহজলভ্য।

দানাদার ইউরিয়া ব্যবহারের অসুবিধা

- দানাদার ইউরিয়া কিস্তিতে কয়েক বার প্রয়োগ করতে হয়।
- এই সার পানিতে মিশে দ্রুত গলে এবং চুঁইয়ে মাটির নিচে গাছের শিকড় অঞ্চলের বাইরে চলে যায়।
- বৃষ্টি বা সেচের পানির সাথে এই সার সহজেই ক্ষেত হতে বের হয়ে যায়।
- এই সার ব্যবহারে অপচয় এবং খরচ বেশি হয়।

গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের সুবিধা

- গুটি ইউরিয়া ফসলের এক মৌসুমে একবার ব্যবহার করা হয়।
- গুটি ইউরিয়ার ব্যবহারের ২০-৩০ ভাগ নাইট্রোজেনের সাশ্রয় হয়।
- গুটি ইউরিয়া ধীরে ধীরে গাছকে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে।
- গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের ফলে ফলন ১৫-২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের অসুবিধা

- গাছের শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- চাহিদা অনুযায়ী গুটির আকার পাওয়া দুষ্কর।
- শুকনো মাটিতে প্রয়োগ করা যায় না।
- সার প্রয়োগ করতে সময় ও শ্রম বেশি লাগে।

ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার প্রয়োগ পদ্ধতি

গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের পাঁচ থেকে সাত দিন পূর্বে ২০×২০ সে.মি. লাইন থেকে লাইন এবং চারা থেকে চারার দূরত্বে ধানের চারা রোপণ করতে হবে। ধানের চারা রোপণের ৫-৭ দিনের মধ্যে মাটি শক্ত হওয়ার আগে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করা জরুরি। জমিতে যখন ২-৩ সে.মি. পরিমাণ পানি থাকে সে সময় গুটি ইউরিয়া ব্যবহার সহজ হয়।

গুটি ইউরিয়ার ওজন বিভিন্ন রকমের হয়। যথা: ০.৯ গ্রাম, ১.৮ গ্রাম এবং ২.৭ গ্রাম। ওজন অনুযায়ী ধান ক্ষেতে ব্যবহারের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ওজন যদি ০.৯ গ্রাম হয় তবে চারটি গোছার মাঝখানে বোরো ধানে ৩টি এবং আমন ও আউশে ২টি করে ব্যবহার করতে হবে। ওজন যদি ১.৮ গ্রাম হয় তবে বোরোতে ২টি এবং আমন-আউশে ১টি করে ব্যবহার করতে হবে। আবার ওজন যদি ২.৭ গ্রাম হয় তবে বোরোতে ১টি গুটি প্রয়োগই যথেষ্ট।

গুটি ইউরিয়া লাইনে চাষ করা ক্ষেতে প্রয়োগ করা সুবিধাজনক। প্রথম লাইনের প্রথম চার গোছার মাঝে ১০ সেমি. গভীরে গুটি ইউরিয়া পুঁতে দিতে হয়। এরপর চার গোছা বাদ দিয়ে পরবর্তী চার গোছার মাঝে একই গভীরতায় পুঁতে দিতে হবে। প্রথম লাইন শেষ করে দ্বিতীয় লাইনে, তৃতীয় লাইনে, চতুর্থ লাইনে গুটি ইউরিয়া পুঁতে দিতে হবে। এভাবে সমগ্র ক্ষেতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র : গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে ধান চাষে কোন ধরনের সার প্রয়োগ করা লাভজনক তা ব্যাখ্যা করবে।

নতুন শব্দ : দানাদার ইউরিয়া, গুটি ইউরিয়া

পাঠ-২ : গরু মোটাতাজাকরণ

আমাদের দেশে ধান ও শাকসবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও পশুসম্পদের উন্নতি তেমন হয়নি। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে প্রানিসম্পদের উন্নতি না হলে জনগণকে প্রয়োজনীয় আমিষ সরবরাহ করা যাবে না। কারণ একজন মানুষের দৈনিক ১২০ গ্রাম মাংসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ দৈনিক মাথাপিছু ২৪ গ্রাম মাংস খেয়ে থাকে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাদের দেশে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের ঘাটতি রয়েছে। এ কারণে গো-মাংসের সরবরাহ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ সমস্যা দুরীকরণের লক্ষ্যেই গরু-বাছুর মোটাতাজাকরণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অল্প সময়ে গরুকে মোটাতাজা করে অধিক মূল্যে বাজারজাত করা হয় এবং অধিক লাভ পাওয়া যায়।

গরু মোটাতাজাকরণ পদ্ধতি

মোটাতাজাকরণ পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো :

১) **গরু নির্বাচন ও ক্রয় করা :** ষাঁড় গরু মোটাতাজাকরণের জন্য ভালো। এ জন্যে দেড়-দুই বছর বয়সের এঁড়ে বাছুর ক্রয় করা উত্তম।

২) **বাসস্থান নির্মাণ :** প্রতিটি গরুর জন্য ১.৫ মি. × ২ মি. জায়গায় ঘর নির্মাণ করতে হবে।

৩) **রোগব্যাধির চিকিৎসা :** এ ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। সংক্রামক রোগের টিকা দেওয়া জরুরি।

৪) **খাদ্য সরবরাহ :** পশুকে এমন খাদ্য দিতে হবে যাতে আমিষ, শর্করা, চর্বি, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিনের পরিমাণ খাদ্যে বেশি থাকে।

মোটাতাজাকরণে খাদ্য তৈরি প্রক্রিয়া : পশু মোটাতাজাকরণ অর্থ হচ্ছে পরিমিত খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে গরুর স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং মানুষের জন্য আমিষ সরবরাহের ব্যবস্থা করা। খাদ্য থেকে পশু পুষ্টি পায় এবং শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে। পশুকে এমন খাদ্য দিতে হবে যাতে আমিষ, শর্করা, চর্বি, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন সাধারণ খাদ্যের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণ থাকে। খড়, কুড়া, ভুট্টা বা গম ভাঙা, ঝোলাগুড়, খৈল ইত্যাদিতে আমিষ, শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাদ্য থাকে। আর সবুজ কাঁচা ঘাস, হাড়ের গুঁড়া ইত্যাদিতে খনিজ লবণ ও ভিটামিন থাকে।

ইউরিয়া ও ঝোলাগুড় মেশানো খাদ্য পশু মোটাতাজাকরণের সহায়ক। এগুলো দুইভাবে মিশিয়ে খাওয়ানো যায় (১) খড়ের সাথে মিশিয়ে এবং (২) দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে।

খড়ের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে গো-খাদ্য তৈরি

- প্রথমে একটি ডোল নিয়ে এর চারপাশ কাদা মিশিয়ে লেপে শুকিয়ে নিতে হবে।
- এরপর একটি বালতিতে ২০ লিটার পানি নিতে হবে।
- এই পানিতে ১ কেজি ইউরিয়ার দ্রবণ তৈরি করতে হবে।
- ২০ কেজি খড় ডোলের মধ্যে ছোটো ছোটো করে কেটে অল্প অল্প করে দিয়ে ইউরিয়া দ্রবণ খড়ের উপর ছিটিয়ে চেপে চেপে ভরতে হবে।
- এভাবে সম্পূর্ণ ডোল খড় দিয়ে ভরতে হবে।
- ডোলে খড় ভরা সম্পূর্ণ হলে এর মুখ ছালা বা পলিথিন দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।
- ১০ - ১২ দিন পর খড় বের করে রোদে শুকাতে হবে।
- এরপরই খড় গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হবে।
- সাধারণ একটি গরুকে প্রতিদিন ৩ কেজি ইউরিয়া মেশানো খড় খাওয়াতে হবে।
- খড়ের সাথে দৈনিক ৩০০-৪০০ গ্রাম ঝোলাগুড় মিশিয়ে দিতে হবে।
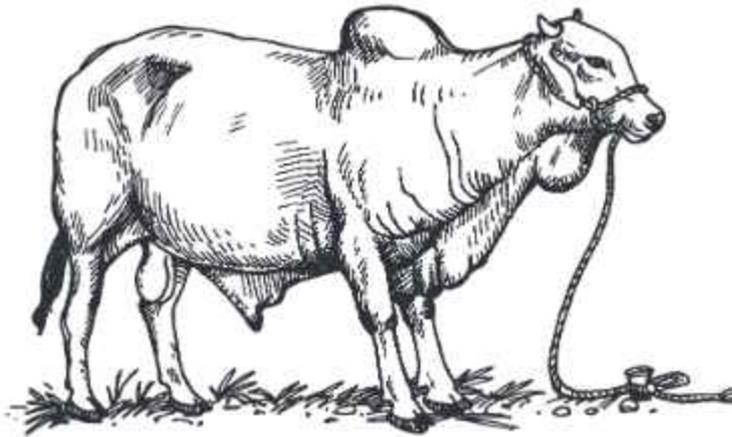
চিত্র : মোটাতাজা গরু

কাজ : দশটি গরু মোটাতাজা করার জন্য কী পরিমাণ ইউরিয়া, খড় ও ঝোলাগুড় লাগবে তা হিসাব করে বের কর।

নতুন শব্দ : প্রাণিসম্পদ, গরু মোটাতাজাকরণ, ডোল, ঝোলাগুড়।

পাঠ- ৩ : ফসলের রোগ ও তার প্রতিকার

ফসলের রোগের ধারণা

আমরা কি জানি ফসলের রোগ হয়? আমরা হয়ত ভাবতে পারি মানুষের রোগ হয়, পশুপাখির রোগ হয়, ফসলের আবার রোগ হয় নাকি? হ্যাঁ, ফসলেরও রোগ হয়। প্রত্যেক জীবেরই জীবন আছে, রোগ আছে আবার মরণও আছে। জীবের চারপাশে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়াসহ আরও অনেক অণুজীব আছে যারা রোগ-বালাই ছড়ায়। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। রোগাক্রান্ত মানুষ ও জীবজন্তুকে যেমন চিকিৎসা করে সুস্থ করা হয় তেমনি ফসলেরও চিকিৎসা করা হয় এবং নিরোগ করা হয়। অনেক সময় সুচিকিৎসা না হলে ফসল মরে যায়।

আমরা যদি ফসলের মাঠে যাই তবে অনেক রোগের লক্ষণ দেখতে পাব -

- কোনো কোনো ফসলের পাতায় বা কাণ্ডে নানা প্রকার দাগ।
- কোনো কোনো ফসলের পাতায় ঘরের মেঝের মোজাইকের মতো হলুদ-সবুজ মেশানো ছোপ ছোপ রং।
- কোনো ফসলের শিকড় পচা।

চিত্র : ফসলের রোগ (ধান)

- আবার বীজতলায়ও দেখতে পাব অনেক ঢলে পড়া বা পচা চারা গাছ।

এগুলো হচ্ছে গাছের রোগের লক্ষণ। এই লক্ষণ দেখেই কৃষকেরা সতর্ক হন এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন।

এখন আমরা নিশ্চয় জানতে চাইব ফসলের রোগ বলতে কী বোঝায়? যদি ফসলের শারীরিক কোনো অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয়। যেমন- ফসলের বৃদ্ধি ঠিকমতো হচ্ছে না, দেখতে দুর্বল ও লিকলিকে, ফুল অথবা ফল ঝরে যাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে ফসলের কোনো না কোনো রোগ হয়েছে। নানা লক্ষণে ফসলের রোগ প্রকাশ পায়। ভিন্ন ভিন্ন ফসলের ভিন্ন ভিন্ন রোগ হয়, ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণও দেখা দেয়। নিচে কতকগুলো রোগাক্রান্ত ফসলের লক্ষণ উল্লেখ করা হলো:

১। **দাগ :** ফসলের পাতায়, কাণ্ডে বা ফলের গায়ে নানা ধরনের দাগ বা স্পট দেখা দেয়। দাগের রং কালো, হালকা বাদামি, গাঢ় বাদামি কিংবা দেখতে পানিতে ভেজার মতো হয়। ফসলের এসব দাগ বিভিন্ন রোগের কারণে হয়। যেমন- ধান গাছের বাদামি দাগ একটি ছত্রাকজনিত রোগের লক্ষণ।

২। **ধ্বসা রোগ :** পাতা ঝলসে যায়। যেমন- ধান ও আলুর ধসা রোগ।

৩। **মোজাইক :** ফসলের পাতায় যখন গাঢ় ও হালকা হলদে-সবুজ এর ছোপ ছোপ রং দেখা যায় তখন এই লক্ষণকে মোজাইক বলা হয়। ঢেড়শ ও মুগে মোজাইক রোগ দেখা যায়। এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগের লক্ষণ।

চিত্র : ঢেড়শের মোজাইক রোগ

৪। **ঢলে পড়া :** অনেক সময় ফসলের কাণ্ড ও শিকড় রোগে আক্রান্ত হলে ফসলের শাখাগুলো মাটির দিকে ঝুলে পড়ে। এই অবস্থাকে ঢলে পড়া রোগ বলে। যেমন- বেগুনের ঢলে পড়া রোগ।

চিত্র : বেগুনের ঢলে পড়া রোগ

৫। **পাতা কুঁকড়িয়ে যাওয়া :** ভাইরাসজনিত কারণে ফসলের পাতা কুঁকড়িয়ে যায়। পেঁপে, টমেটো এসব ফসলে পাতা কুঁকড়িয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যায়।

প্রতিকার : রোগাক্রান্ত হওয়ার পুর্বে ফসলের রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হয়। কারণ, ফসল একবার রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে প্রতিকার করা কঠিন। তাই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটার আগে নিচে উল্লিখিত প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করা জরুরি :

১। **জীবাণুমুক্ত বীজ ব্যবহার করা :** বীজের মাধ্যমে অনেক রোগ ছড়ায়। তাই কৃষককে নীরোগ বীজ সংগ্রহ করতে হবে বা বীজ শোধন করে বুনতে হবে।

২। **বীজ শোধন :** অনেক বীজ আছে নিজেরাই রোগ বহন করে। বীজবাহিত রোগ জীবাণু নীরোগ করার জন্য বীজ শোধন একটি উত্তম প্রযুক্তি। এজন্য ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা হয়।

৩। **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফসল আবাদ করা :** ফসলের ক্ষেতে আগাছা থাকলে ফসল রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কারণ আগাছা অনেক রোগের উৎস। তাই আগাছা পরিষ্কার করে চাষাবাদ করতে হবে।

৪। **রোগাক্রান্ত গাছ পুড়িয়ে ফেলা বা মাটিতে পুঁতে ফেলা :** এক গাছ রোগাক্রান্ত হলে অন্য গাছেও ছড়িয়ে পড়ে। যাতে রোগ পুরো মাঠে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য নির্দিষ্ট রোগাক্রান্ত গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। নতুবা মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা পাঠে উল্লেখিত রোগাক্রান্ত উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করে শ্রেণিতে আলোচনা ও উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : পাতার দাগ, ধসারোগ, মোজাইক, বীজ শোধন, ছত্রাক, ভাইরাস

পাঠ- ৪ : মৃত পশুপাখি ও মাছের ব্যবস্থাপনা

ক. মৃত পশুর সৎকার
খ. মৃত পাখির সৎকার
গ. মৃত মাছের সৎকার

ক. মৃত পশুর সৎকার : মৃত পশুকে যেখানে সেখানে ফেলে রাখা যাবে না। মৃত পশু পরিবেশ দূষিত করে। পশুর রোগজীবাণু বাতাসে ছড়ায় এবং সুস্থ পশুকে আক্রান্ত করে। তাই মৃত্যুর পর অতি দ্রুত পশুর সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। খামার ও বসতবাড়ি হতে দূরে মৃত পশুকে সৎকার করতে হবে। মৃত পশুকে উঁচু স্থানে মাটির ১:২২ মিটার (৪ ফুট) গভীরে গর্ত করে মাটি চাপা দিতে হবে। মাটি চাপা দেওয়ার সময় গর্তের উপরের স্তরে চুন বা ডিডিটি ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এর উপর মাটি ছিটিয়ে দিতে হবে।
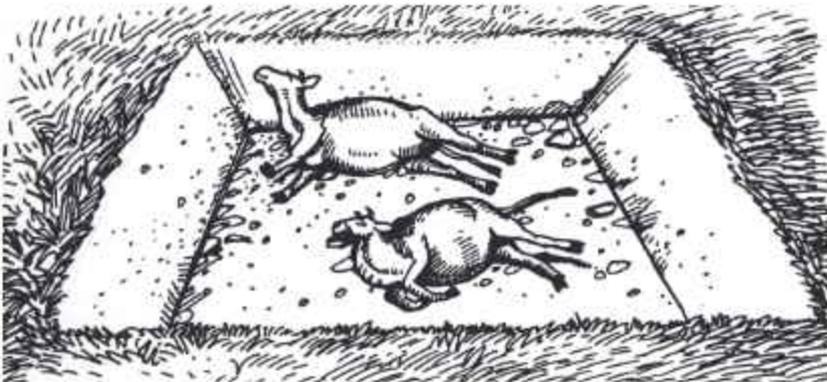
চিত্র : মৃত পশু গর্তে ফেলা হচ্ছে

খ. মৃত পাখির সৎকার : খামার ও বসত বাড়ি থেকে দূরে সৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। হাঁস মুরগির মৃত্যুর পর যেখানে সেখানে না ফেলে একটি গর্ত করে মাটি চাপা দিতে হবে। অন্যথায় মৃত পাখি থেকে রোগজীবাণু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং এলাকার সুস্থ ও জীবিত পাখিকে আক্রান্ত করবে। খামারে মহামারী আকারে একসাথে অনেক পাখির মৃত্যু হলে বড়ো গর্তে মাটি চাপা দিয়ে মাটির উপর DDT (Dichloro Diphenyl Trichloroethane) ছিটিয়ে দিতে হবে।

গ. মৃত মাছের সৎকার : অনেক সময় চিকিৎসা করেও রোগাক্রান্ত মাছকে নীরোগ করা যায় না। বিপুল হারে মাছ মরতে শুরু করে। অতঃপর পচে দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং পরিবেশ দূষিত হয়। এমতাবস্থায় নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে–

- জাল দিয়ে মৃত মাছগুলোকে সংগ্রহ করতে হবে।
- পুকুর থেকে অনেক দূরে যেখান থেকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে সেখানে তিন ফুট গভীর গর্ত করতে হবে।
- মাছের সংখ্যানুযায়ী প্রশস্ত গর্ত করতে হবে।
- গর্তে মৃত মাছ নিক্ষেপ করে এর উপর ব্লিচিং পাউডার Ca (OCl)Cl ছিটাতে হবে।
- অতঃপর মাটি চাপা দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণ

পাঠ- ৫ : মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণ

কৃষক তার ফসলের মাঠে কী কী ফসল ফলান তা আমরা দেখেছি কি? ফসলের মাঠ পরিদর্শনকালে আমরা দেখতে পাব কোন মাঠ ধানভিত্তিক, কোনটা ইক্ষুভিত্তিক, কোনটা তুলাভিত্তিক আর কোনটা পাটভিত্তিক।

মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণ বলতে কোনো একক ফসল বা একক প্রযুক্তির উপর নির্ভর না করে ফসল বিন্যাস, মিশ্র ও সাথি ফসলের চাষ ও খামার যান্ত্রিকীকরণকে বোঝায়। শস্য বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে–

১। কাঙ্ক্ষিত ফসল বিন্যাস, শস্যের আবাদ বাড়ানো এবং কৃষকের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

২। খামারের কর্মকাণ্ড সমন্বয় করা এবং কৃষি পরিবেশের উপর প্রতিকূল প্রভাব কমিয়ে আনা।

৩। প্রচলিত শস্যবিন্যাসে উন্নত ফসলের জাত ও কলাকৌশলের সংযোগ ঘটানো।

৪। বীজের সাশ্রয় করা এবং উৎপাদন খরচ কমানো।

৫। প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষকদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা ও সমাধান করা।

১। **ফসলবিন্যাস :** বাংলাদেশের ভূমি নানা জাতের ফসল চাষের উপযোগী। তবে প্রতিটি কৃষকই ফসলের বিন্যাস করে আবাদ করেন। ফসলবিন্যাস অর্থ হচ্ছে কৃষক সারা বছর বা ১২ মাস তার জমিতে কী কী ফসল ফলাবেন তার একটা পরিকল্পনা করা। ফসলবিন্যাস করা হয় মাটির গুণাগুণ, পানির প্রাপ্যতা, চাষ পদ্ধতি, শস্যের জাত, ঝুঁকি, আয় এসব বিষয় বিবেচনা করে। ফসলবিন্যাসে একটি শিম জাতীয় ফসল অর্ন্তভুক্ত করে সারের চাহিদা হ্রাস করা সম্ভব এবং তাতে মাটির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাবে।

২। **মিশ্র ও সাথি ফসলের চাষ :** মিশ্র ও সাথি ফসলের চাষ বলতে একাধিক ফসল যা ভিন্ন সময়ে পাকে, ফসলবৃদ্ধির ধরন ভিন্ন এবং মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে খাদ্য আহরণ করে এরূপ ফসলের একত্রে চাষকে বোঝায়। মিশ্র ও সাথি ফসলে পোকামাকড়, রোগবালাই এবং আবহাওয়াজনিত ঝুঁকি হ্রাস পায়। মিশ্র ফসলে একাধিক ফসলের বীজ একসাথে মিশিয়ে জমিতে বপন করা হয়। কিন্তু সাথি ফসলের ক্ষেত্রে প্রতিটি ফসলের বীজ আলাদা সারিতে বপন করা হয় বা আলাদা সারিতে ফসলের চারা রোপণ করা হয়।

৩। **শূন্য চাষ পদ্ধতি :** শূন্য চাষ অর্থ হচ্ছে বিনা চাষে ফসল ফলানো। বন্যাকবলিত এলাকায় ধানভিত্তিক ফসল বিন্যাসে শূন্য চাষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন, বন্যার পানি নেমে গেলে মাটিতে রস থাকা অবস্থায় মসুর, ভুট্টা, রসুন ইত্যাদি রোপণ বা লাগানো যায় এবং ভালো ফলনও পাওয়া যায়। এতে কৃষকের ৩-৪ সপ্তাহ সময় বাঁচে।

৪। **রিলে চাষ :** কৃষকেরা একটি শস্যে ফুল আসার পর, কিন্তু অন্য শস্য কর্তনের প্রায় এক সপ্তাহ আগে কতিপয় সুবিধা পাওয়ার জন্য শিম জাতীয় বীজ বপন করেন। একেই রিলে চাষ বলা হয়। রিলে চাষের উদ্দেশ্য হলো সেচের সীমাবদ্ধতা, শ্রমঘাটতি এবং সময়ের অভাব দূর করা। আমাদের কৃষকেরা সাধারণত ধানের ক্ষেতে রিলে চাষ করে থাকেন। রিলে চাষ দ্বারা মাটির গঠন উন্নত হয় এবং উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

৫। **সম্পদের সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার :** মাঠ ফসল বহুমুখীকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে- (১) অধিক উৎপাদন এবং (২) অধিক আয়। জমি, সময়, বীজ, সার, সেচের পানি, কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি প্রযুক্তি এগুলো হচ্ছে কৃষকের কৃষি সম্পদ। কৃষকের আয় নির্ভর করে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর। যেমন- মিশ্র বা সাথি ফসলের চাষ হতে কৃষক অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন। আবার বিনা চাষে ফসল ফলালে সময় ও অর্থ উভয়ের সাশ্রয় হয়। আবার ফসল বিন্যাসে শিম জাতীয় শস্য আবাদের ব্যবস্থা থাকলে সারের চাহিদা হ্রাস পাবে।

চিত্র : আখের সাথে আলু

চিত্র : গম, মুগ, ভুট্টা

চিত্র : শস্য বহুমুখীকরণ

কাজ : তোমার এলাকায় শস্য বহুমুখীকরণে কীভাবে সাথি ফসল চাষ করা হয় বর্ণনা কর।

নতুন শব্দ : শস্য বহুমুখীকরণ, ফসলবিন্যাস, মিশ্র চাষ, সাথি ফসল, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার।

পাঠ-৬ : মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণের ব্যবহার

বাংলাদেশের জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণভাবাপন্ন। এখানে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের প্রাধান্য আছে। ফলে সারা বছরই এখানে তিনটি মৌসুমে নানাবিধ ফসল উৎপাদন করা যায়। এগুলো হলো রবি, খরিপ-১, খরিপ-২। প্রতি মৌসুমে কৃষক তার ফসলবিন্যাসে সেসব ফসল অন্তর্ভুক্ত করেন। ফসলের উৎপাদন সময়, মাটির উর্বরতা, সেচের সুবিধা এসব বিষয় বিবেচনায় এনে ফসল নির্বাচন করেন। নিচে মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণের ব্যবহার হিসেবে কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করা হলো:

১। **আলুর সাথে রিলে ফসল হিসেবে পটলের চাষ :** এটি শস্য বহুমুখীকরণের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কৃষক নিজেদের আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে চাষাবাদে অনেক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার মধ্যে আলুর সাথে রিলে ফসল হিসেবে পটলের চাষ বেশ জনপ্রিয়। রিলে ফসল অর্থ হচ্ছে একটি ফসলের শেষ পর্যায়ে আরেকটি ফসলের চাষ শুরু করা। এক্ষেত্রে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে কৃষকেরা আগাম আলু চাষ করেন। ৫৫ সে.মি দূরত্বে সারি করে আলু লাগানো হয়। প্রতি তৃতীয় সারি ফাঁকা রেখে সে সারিতে ডিসেম্বরে পটলের ডগা রোপণ করা হয়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে আলু উত্তোলন শেষ হয়। পটল গাছ বড় হতে থাকে এবং মার্চ মাস থেকে পটল ধরতে থাকে এবং নভেম্বর মাস পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়।

এ প্রযুক্তিতে পটলের জন্য আর সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন পড়ে না। আর একই জমি হতে এভাবেই বাড়তি আয় সম্ভব।
অনুরূপভাবে আলুর সাথে রিলে ফসল হিসেবে করলার চাষ করা যায়।

২। **মিশ্র ফসল হিসেবে আলু ও লালশাকের চাষ :** লালশাক স্বল্পমেয়াদি কিন্তু বর্ধনশীল। আলুর সাথে লাল শাকের চাষ একটি ভালো মিশ্র চাষ। আগেই বলা হয়েছে যে, সারিতে আলুর চাষ করা হয়। যখন আলু গাছের উচ্চতা ৫-৬ সে.মি. হয় তখন সারি বরাবর প্রথম মাটি তোলা হয়। এই তোলা মাটিতে লাল শাকের বীজ বপন করা হয়। আলু ও লাল শাক দুইটাই সমান সমান বাড়তে থাকে। লাল শাক দ্রুত বর্ধনশীল। তাই কয়েক দফা শাক উঠানো হয়। ডিসেম্বর পর্যন্ত লাল শাক উঠানো যায়। লাল শাক তোলার পরও আলু বড়ো হতে থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে আলু তোলা হয়।

উল্লিখিত শস্যবহুমুখীকরণ পদ্ধতি ছাড়াও সাথি ফসল হিসেবে-

ক. আখের সাথে টমেটোর চাষ হয়;

খ. আখের সাথে সরিষার চাষ হয়;

গ. আখের সাথে মসুরের চাষ হয়।

মিশ্র ফসল হিসেবে-

ক. মসুরের সাথে সরিষার চাষ হয়;

খ. আউশের সাথে তিলের চাষ হয়;

গ. কলা বাগানে আউশের চাষ হয়।

চিত্র : কলার সাথি ফসল আলু

কাজ : একটি সাথি ফসলের জমি পর্যবেক্ষণ করে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দাও।

নতুন শব্দ : মিশ্র ফসল, রিলে ফসল

পাঠ-৭ : শস্যপর্যায়ের ধারণা

শস্যপর্যায় একটি উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি। এর দ্বারা মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকে, ফসল ভালো হয়, অধিক ফলন হয়। রোগ-পোকা কম হয় এবং সারের কার্যকারিতা ভালো হয়। প্রযুক্তি হিসেবে শস্যপর্যায়ের ব্যবহার সব দেশেই প্রচলিত।

মাটির উর্বরতা বজায় রেখে এক খণ্ড জমিতে শস্য ঋতুর বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করার নাম শস্যপর্যায়। অর্থাৎ একই ধরনের ফসল একই জমিতে বার বার উৎপাদন না করে অন্য জাতের ফসল উৎপাদন করাই হচ্ছে শস্যপর্যায়। যেমন- গভীরমূলী ফসল উৎপাদনের পর অগভীরমূলী জাতীয় ফসলের আবাদ করা উচিত। ফলে পোকা-মাকড় ও রোগ-পোকার উপদ্রব কম হয় এবং মাটির বিভিন্ন গভীরতা থেকে পুষ্টি উপাদান শোষণ সম্ভব হয়।

কৃষক শস্যপর্যায় প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য তার সমগ্র জমিকে তিন বা চার খণ্ডে ভাগ করেন। প্রথম বছর খণ্ডগুলোতে রবি, খরিপ-১, খরিপ-২ মৌসুম অনুযায়ী বিভিন্ন ফসল ফলানো হয়। প্রথম বছর শেষ হলে দ্বিতীয় বছরে প্রথম খণ্ডের ফসল দ্বিতীয় খণ্ডে, দ্বিতীয় খণ্ডের ফসল তৃতীয় খণ্ডে- এভাবে শেষ খণ্ডের ফসল প্রথম খণ্ডে চাষ করা হয়। দ্বিতীয় বছরের পরে তৃতীয় বছরে একইভাবে বিভিন্ন ফসলের খণ্ড পরিবর্তন হয়। তৃতীয় বছরে শস্যের আবর্তন শেষ হয় এবং প্রত্যেক ফসলই প্রতি খণ্ডে একবার করে চাষ করা হয়।

শস্য পর্যায়ের জন্য এমন ফসল নির্বাচন করতে হবে যাতে নিচে উল্লিখিত বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়-

- পর পর একই ফসলের চাষ না করা;
- একই শিকড়বিশিষ্ট ফসলের চাষ না করা;
- ফসলের পুষ্টি চাহিদার কম-বেশি অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করা;
- ফসলের তালিকায় ডাল ফসল অন্তর্ভুক্ত করা;
- সবুজ সার যেমন- ধৈঞ্চা চাষ করা;
- গবাদি পশুর খাবারের জন্য ঘাসের চাষ করা:
- খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসলের চাষ করা।

শস্যপর্যায় প্রযুক্তির সুবিধা

শস্যপর্যায়ের অনেক সুবিধা লক্ষ করা যায়। সুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো-

- শস্যপর্যায়ের প্রযুক্তি ব্যবহারে মাটির উর্বরতা সংরক্ষিত হয়;
- মাটির পুষ্টির সমতা বজায় থাকে;
- আগাছার উপদ্রব কম হয়;
- রোগ ও পোকার উপদ্রব কম হয়;
- পানির অপচয় কম হয়;
- ফসলের ফলন বাড়ে;
- গবাদি পশুর খাবারের ব্যবস্থা হয়।

চিত্র : বিভিন্ন ফসলের শস্য পর্যায়

- উচ্চমাত্রায় শস্য বহুমুখীকরণ প্রযুক্তি গ্রহণ করা যায়।
- বালাইনাশক (আগাছানাশক, ছত্রাকনাশক, ব্যাকটেরিয়ানাশক, কীটনাশক) ব্যবহার কমায়।
- গাছ পরিমিত পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারে।
- মাটিতে নাইট্রোজেন যুক্ত হয়।

কাজ : তোমার গ্রামের কৃষকেরা শস্যপর্যায় ব্যবহার করেন। তুমি তাদের সাথে আলোচনা করে কেন এবং কীভাবে তারা শস্যপর্যায় অনুসরণ করেছেন সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লিখে জমা দিবে।

নতুন শব্দ : শস্যপর্যায়, গভীরমূলী, অগভীরমূলী ফসল

পাঠ- ৮ : শস্যপর্যায়ের ব্যবহার

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা শস্যপর্যায়ের ধারণা পেয়েছি। আমাদের কৃষক জেনে অথবা না জেনে শস্যপর্যায় প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তি হয়ত তারা দিতে পারবেন না। কিন্তু এতটুকু জ্ঞান তাদের আছে যে, একই ফসল একই জমিতে বছরের পর বছর চাষ করলে ফলন কম হয়। মাটির উর্বরতা কমে যায়। পোকামাকড় ও রোগসহ নানা সমস্যা দেখা দেয়। কৃষকেরা তাদের জমিতে যত ফসল ফলান সেগুলোকে রবি, খরিপ-১, খরিপ-২ এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। কাজেই কৃষক প্রথমত:মৌসুম অনুযায়ী কী ফসল চাষ করবেন তা নির্ধারণ করেন। দ্বিতীয়তঃ কোন জমিতে কী ফসল ফলাবেন তাও নির্ধারণ করেন। শস্যপর্যায়ের বিধি অনুযায়ী কৃষকের জমিকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করার প্রয়োজন পড়ে। আর খণ্ডগুলোর আকার সমান রাখার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের কৃষকদের জমি বিভিন্ন খণ্ডে ভাগ হয়ে আছে যা আকারে সমান নাও হতে পারে। কৃষকদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই তারা জমি ও ফসল নির্বাচন করেন।

পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার প্রায় সব এলাকা এবং দিনাজপুরের উত্তর-পশ্চিম অংশ কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১ এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে উঁচু, মাঝারি উঁচু, মাঝারি নিচু জমি আছে। এখানকার কৃষক গম, পাট অথবা বোনা আউশ, কাউন, রোপা আমন, আলু, শাকসবজি, মুগডাল, আখ, মরিচ, বোরো, ভুট্টা ইত্যাদি ফসল চাষ করেন। কৃষকেরা বৃষ্টিপাত নির্ভর ফসল ফলান আবার সেচ নির্ভর ফসলও ফলান। এখানকার কৃষক কী কী শস্যপর্যায় ব্যবহার করেন তা দেখলে আমরা কৃষকের শস্যপর্যায় ব্যবহারের একটা বাস্তব চিত্র পাব।

মনে করি, ঠাকুরগাঁওয়ের কোনো কৃষকের চার খণ্ড জমি আছে। তিনি চার বছরের শস্যপর্যায়ের একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি রবি, খরিপ-১ এবং খরিপ-২ মৌসুমভিত্তিক গম, পাট/আউশ, রোপা আমন, আলু, শাকসবজি, ধৈঞ্চা, আখ, মরিচ, তিল ইত্যাদি ফসল ফলাবেন।

এগুলো ফলানোর জন্য কৃষক বছরভিত্তিক নিম্নোক্ত শস্যপর্যায় গ্রহণ করতে পারেন। শস্যপর্যায়ক্রমে দেখা যায় যে প্রথম বছরে যেভাবে ফসল উৎপাদন শুরু হয়েছিল চতুর্থ বছর শেষে পঞ্চম বছরে সেভাবেই ফসল উৎপাদন শুরু হবে।

সময়	খণ্ড-১	খণ্ড-২	খণ্ড-৩	খণ্ড-৪
১ম বছর	রবি : বোরো খরিপ-১ : পাট/বোনা আউশ খরিপ-২ : পতিত	রবি : সরিষা/গম খরিপ-১ : মুগ খরিপ-২ : রোপা আমন	রবি : গোল আলু খরিপ-১ : মাসকলাই খরিপ-২ : রোপা আমন	রবি : ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, টমেটো খরিপ-১ : ভুট্টা খরিপ-২ : বেগুন
২য় বছর	রবি : ফুলকপি, বাঁধাকপি মুলা, টমেটো খরিপ-১ : ভুট্টা খরিপ-২ : বেগুন	রবি : বোরো খরিপ-১:পাট/বোনা আউশ খরিপ-২ : পতিত	রবি : সরিষা/গম খরিপ-১ : মুগ খরিপ-২ : রোপা আমন	রবি : গোল আলু খরিপ-১ : মাষকলাই খরিপ-২ : রোপা আমন
৩য় বছর	রবি : গোল আলু খরিপ-১ : মাষকলাই খরিপ-২ : রোপা আমন	রবি : ফুলকপি, বাঁধাকপি মুলা, টমেটো খরিপ-১ : ভুট্টা খরিপ-২ : বেগুন	রবি : বোরো খরিপ-১ : পাট/বোনা আউশ খরিপ-২ : পতিত	রবি : সরিষা/গম খরিপ-১ : মুগ খরিপ-২ : রোপা আমন
৪র্থ বছর	রবি : সরিষা/গম খরিপ-১ : মুগ খরিপ-২ : রোপা আমন	রবি : গোল আলু খরিপ-১ : মাষকলাই খরিপ-২ : রোপা আমন	রবি : ফুলকপি, বাঁধাকপি মুলা, টমেটো খরিপ-১ : ভুট্টা খরিপ-২ : বেগুন	রবি : বোরো খরিপ-১ : পাট/বোনা আউশ খরিপ-২ : পতিত
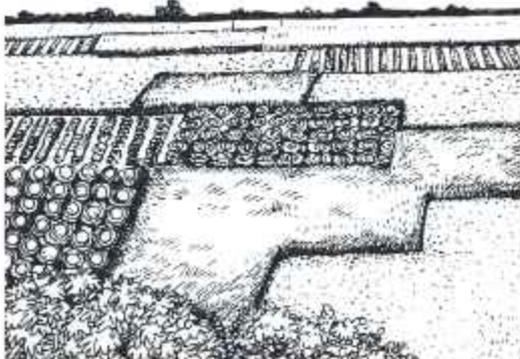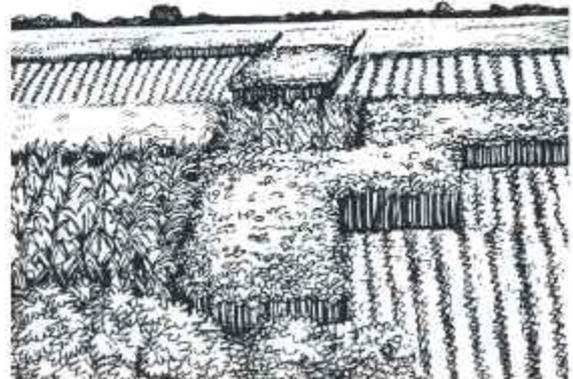
চিত্র : শস্যপর্যায়ের ব্যবহার

কাজ : তোমার বাবা তোমার কাছে একটি শস্যপর্যায়ের পরিকল্পনা চাইলেন। উল্লিখিত নমুনা শস্য পর্যায়ের আলোকে তোমার বাবার জন্য একটি শস্যপর্যায় পরিকল্পনা কর যেন আগামী রবি মৌসুম হতে ব্যবহার করা যায় এবং পরিকল্পনাটি শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : রবি, খরিপ-১, খরিপ-২

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মৃত পশুর সৎকারে কোনটি ব্যবহৃত হয়?

ক. ডিডিটি খ. ফরমালিন
গ. ক্লোরিন ঘ. ফসফরাস

২. গরুকে ইউরিয়া ও ঝোলাগুড় খাওয়ানো হয়-

i. খড়ের সাথে মিশিয়ে
ii. দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে
iii. পানির সাথে মিশিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রিনা বেগমের বাড়ির আঙিনায় ৩মি. × ৪মি. আকৃতির উঁচু খালি জায়গা রয়েছে। ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে উক্ত জায়গায় গোশালা নির্মাণ করে গরু মোটাতাজাকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করলেন।

৪. রিনা বেগম তার আঙিনায় কয়টি গরুর বাসস্থান নির্মাণ করতে পারবেন?

ক. ১টি
খ. ২টি
গ. ৩টি
ঘ. ৪টি

৫. রিনা বেগমের খামারটি তার পরিবারে কী ধরনের সুফল বয়ে নিয়ে আসবে?

ক. আমিষের ঘাটতি পূরণ করবে
খ. শর্করার ঘাটতি পূরণ করবে
গ. গবাদিপশুর সংখ্যা বৃদ্ধি করবে
ঘ. দুধের সরবরাহ বৃদ্ধি করবে

২০২৩

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মনির এক একর জমিতে পরপর কয়েক বছর ধান চাষ করে দেখল প্রতি বছর ধানের ফলন কমে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কৃষি কর্মকর্তার সাথে আলাপ করলে তিনি মনিরকে শস্যপর্যায় অবলম্বন করার পরামর্শ দেন।

ক. শস্যপর্যায় কী?

খ. শস্যপর্যায়ে ধৈঞ্চা চাষ করা সুবিধাজনক কেন?

গ. মনির তার জমিতে কীভাবে শস্যপর্যায় করবেন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মনির কৃষি কর্মতার পরামর্শ গ্রহণ করলে কীভাবে লাভবান হবেন বিশ্লেষণ কর।

২.

চিত্র : ১নং চাষ পদ্ধতি
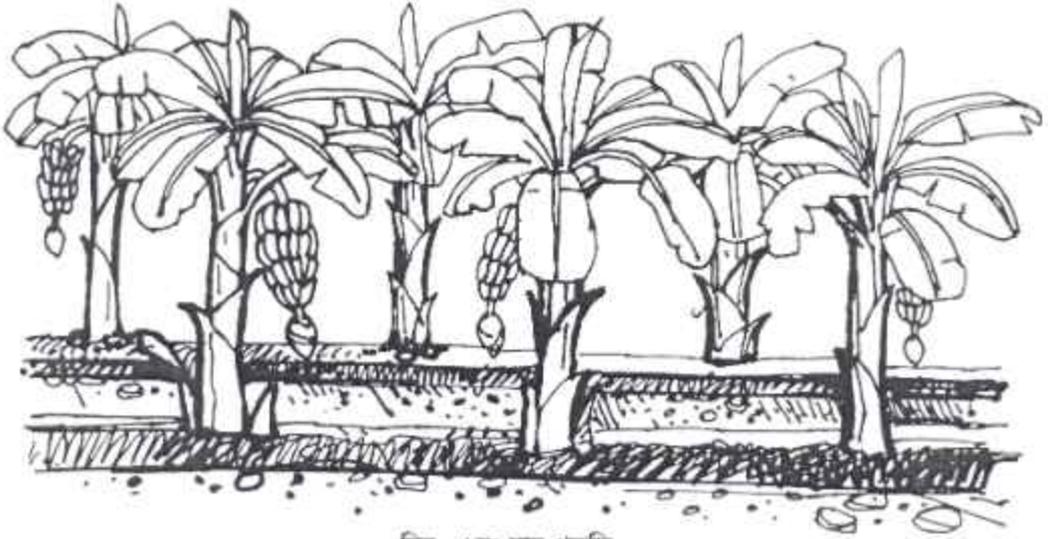
চিত্র : ২নং চাষ পদ্ধতি

ক. সাথি ফসল কাকে বলে?

খ. রিলে চাষের মাধ্যমে কীভাবে সময়ের অভাব দূর করা যায়?

গ. চিত্রের কোন চাষ পদ্ধতিতে উৎপাদন খরচ কম ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রের কোন চাষ পদ্ধতিটি কৃষি পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম তা বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়
কৃষি উপকরণ

আমরা পূর্ববর্তী শ্রেণিতে বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ নিয়ে আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে বীজ বপনের উপযুক্ত মাটি প্রস্তুত করা, আদর্শ বীজতলা তৈরি ও তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাশ্রয়ীরূপে সার ব্যবহার করা ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা হবে। বীজতলার মাটি যদি উপযুক্তভাবে তৈরি করা না যায় তবে সব বীজ গজাবে না। যথাযথভাবে বীজতলা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা না হলে উপযুক্ত মাটি থাকা সত্ত্বেও চারা ভালো হবে না। আর একটি বিষয় হলো, জমিতে সার প্রয়োগ করতে অধিকাংশ কৃষক নিয়ম অনুসরণ করেন না। এতে সারের অপচয় হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই এখানে এই বিষয়গুলো আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত।
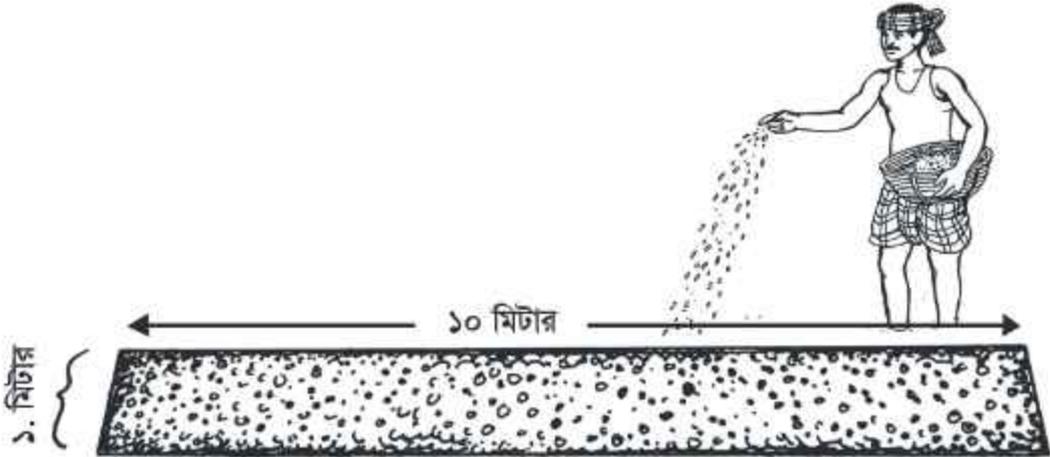
চিত্র : কাদা মাটির জন্য বীজতলা

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বীজ বপনের জন্য উপযুক্ত মাটি প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করতে পারব;
- একটি আদর্শ বীজতলা তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- একটি আদর্শ বীজতলার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জমিতে সাশ্রয়ীরূপে সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
- জমিতে সাশ্রয়ীরূপে সেচ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
- উচ্চ ফলনের সাথে ভালো বীজ নির্বাচন ও সংরক্ষণের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব।

পাঠ–১ : নার্সারিতে বীজ বপনে উপযুক্ত মাটি প্রস্তুত ।

আমরা জানি বীজতলায় বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা হয় । বীজ তলার মাটি ভালোভাবে প্রস্তুত না করে বীজ বপন করলে ভালো চারা উৎপন্ন হয় না ।

বীজতলার মাটি প্রস্তুত করার জন্য যে যে উপকরণ লাগবে তা হলো- জমি, খুঁটি, জায়গা মাপার ফিতা, কোদাল, মই, জৈব ও অজৈব সার ইত্যাদি । আমাদের দেশে দুই ধরনের বীজতলা তৈরি করা হয় । যথা- (ক) শুকনো (খ) ভেজা ।

শুকনো বীজতলায় সরাসরি বীজ বপন করা যাবে । তবে ভেজা বীজতলার ক্ষেত্রে মাটি পানি দ্বারা ভিজিয়ে কাদা করে সমান করতে হবে । অতঃপর বীজ বপন করতে হবে । শুকনা বীজতলায় অঙ্কুরিত বীজ বপন করা হয় না । কিন্তু ভেজা বীজতলায় অঙ্কুরিত বীজ (বিশেষ করে ধান বীজ) বপন করা হয়। বীজতলার মাটি প্রস্তুতির নিয়মগুলো হলো-

১. বীজতলার চারপাশে ৩০ সে.মি. চওড়া ও ১৫ সে:মি: গভীর নালা তৈরি করতে হবে;

২. বীজতলার মাটি ২০-২৫ সে.মি. উঁচু রাখতে হবে;

৩. ১৫-২০ সে.মি. গভীর করে বীজতলার মাটি চাষ করতে হবে;

৪. এ অবস্থায় মাটি ২-৪ দিন রেখে দিলে মাটিতে রোদ লাগবে, পোকা বের হলে পাখি খেয়ে ফেলবে;

৫. এরপর ঘাস, শিকড়, পাথর ইত্যাদি বেছে ফেলে দিতে হবে;

৬. মাটি এঁটেল হলে অন্য জায়গা থেকে দোআঁশ মাটি এনে বীজতলায় মেশাতে হবে, কিন্তু মাটি বেলে হলে জৈব পদার্থ ও দোআঁশ বা এঁটেল মাটি মিশাতে হবে;

৭. বৃষ্টির পানি বা বাতাসে মাটি সরে যেতে পারে সেজন্য চারপাশে ছিদ্র করা ইট বা অন্য কিছু দিয়ে ঘিরে দিলে ভালো হয়;

৮. বীজতলার দলা বা ঢেলা ভেঙে ঝুরঝুরা করে মাটি সমান করতে হবে;

৯. বীজ বপনের ১০-১২ দিন আগে বীজতলায় টিএসপি, এমওপি ও পচা শুকানো গোবর বা আবর্জনা সার মিশিয়ে দিতে হবে;

১০. নার্সারির আকার অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে;

১১. বীজতলার মাটিতে পোকা বা রোগজীবাণু থাকতে পারে । তাই কিছু খড় বিছিয়ে দিয়ে তাতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলে মাটি কিছুটা জীবাণুমুক্ত হবে;

১২. মাটি শোধনের জন্য গ্যামাক্সিন বা ফরমালডিহাইড জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা যেতে পারে ।

পলিব্যাগে ভরার জন্য মাটি : উপরোক্ত নিয়মে প্রস্তুতকৃত মাটি চালনি দ্বারা চেলে ঢেলামুক্ত করতে হবে । তারপর নির্ধারিত মাপের পলিব্যাগে মাটি ভরাট করতে হবে ।

হাতে কলমে কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় বীজ বপনের জন্য মাটি প্রস্তুত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে মাটি তৈরির নিয়মগুলো ধারাবাহিকভাবে নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। এ কাজটি সম্পাদন করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন।

পাঠ–২ : আদর্শ বীজতলা তৈরি

বীজতলা বিভিন্ন আকারের হতে পারে। এখন আমরা একটি আদর্শ বীজতলা সম্পর্কে জানব। এ ধরনের বীজতলার আকার-আকৃতি, সার প্রয়োগ, মাটি প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ সঠিক নিয়মে হয়ে থাকে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে আদর্শ বীজতলার একটি মডেল চিত্র দেখাবেন। মডেল চিত্র দেখে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তা আঁকতে বলবেন। এরপর শিক্ষক আদর্শ বীজতলার নিয়মাবলি উল্লেখ করবেন।

(ক) ধান ফসলের বীজতলা : বীজতলায় বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা হয় এবং রোপণের আগ পর্যন্ত চারার যত্ন নেওয়া হয়। তাই ধানের আদর্শ বীজতলা তৈরির জন্য জমি চাষ ও মই দিতে হয়। সাধারণত বীজতলা দুইভাবে তৈরি করা হয়। যথা– ভেজা কাদাময় বীজতলা ও শুকানো বীজতলা। শুকানো বীজতলা উঁচু বেলে দোআঁশ মাটিতে এবং ভেজা কাদাময় বীজতলা এঁটেল মাটিতে তৈরি করা হয়। গাছের ছায়া পড়ে না ও বর্ষার পানিতে ডুবে যায় না, এমন জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করা হয়।

আদর্শ বীজতলার গঠন : (ধান ফসল)

(১) প্রতিটি বীজতলার আকার হবে ৯.৫ মিটার × ১.৫ মিটার এবং খুঁটি দিয়ে তা চিহ্নিত করতে হবে; (২) দুটি বীজতলার মাঝে ৫০ সে.মি ও বীজতলার চারপাশে ২৫ সে.মি পরিমাণ জায়গা নালা তৈরি করার জন্য রাখতে হবে; (৩) দুইটি বীজতলার মাঝের ও চারপাশের জায়গা থেকে মাটি তুলে বীজতলা ৭-১০ সে.মি. উঁচু করতে হবে; (৪) বীজতলার প্রতি বর্গমিটারে ২ কেজি হারে গোবর বা কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করে বীজতলার মাটির সাথে মেশাতে হবে;
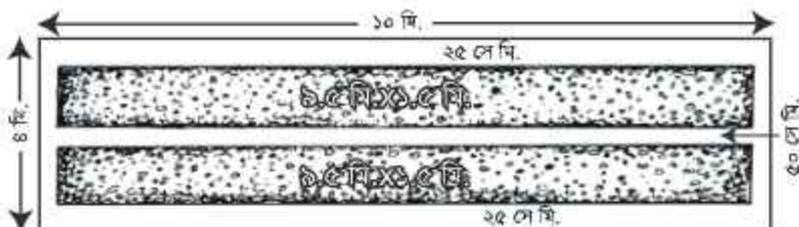
চিত্র : আদর্শ ধান বীজতলা

(খ) উদ্যান ফসলের বীজতলা : নার্সারিতে উদ্যান ফসলের বীজ/চারা/স্ট্যাম্প বপন বা রোপণ করে মূল জমিতে রোপণের উপযোগী করে তোলা হয়। এর ফলে চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত হয় এবং অল্প জায়গায় সুষম পরিচর্যার মাধ্যমে বেশি চারা উৎপাদন করা হয়।

আদর্শ বীজতলার গঠন : (উদ্যান ফসল)

(১) নার্সারির বেড তৈরির জন্য সুনিষ্কাশিত উঁচু, আলো-বাতাসযুক্ত উর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে,
(২) প্রতিটি বেডের আকার হবে ৩ মিটার × ১ মিটার এবং খুঁটি দিয়ে তা চিহ্নিত করতে হবে;
(৩) কোদাল দিয়ে ভালোভাবে কুপিয়ে বেড তৈরি করতে হবে;
(৪) প্রতিটি বেডে ২৫ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার দিয়ে মাটির সাথে উত্তমরূপে মেশাতে হবে;
(৫) পাশাপাশি দুটি বেডের সাথে ৫০ সে.মি. নালা তৈরি করতে হবে;
(৬) নালার মাটি পাশাপাশি দুটি বেডে ভাগ করে দিতে হবে যেন বেডের উচ্চতা ভূমি থেকে ১০সে.মি. উঁচু হয়;
(৭) এরপর প্রতি ৩ বর্গমিটার বেডের জন্য ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমওপি সার ছিটিয়ে মাটির সাথে মেশাতে হবে;
(৮) মাটি অধিক অম্লীয় হলে বেড প্রতি ১৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করতে হবে;
(৯) রশি, খুঁটি সরিয়ে বেডের উপরের মাটি সমান করে বীজ বপন করতে হবে;
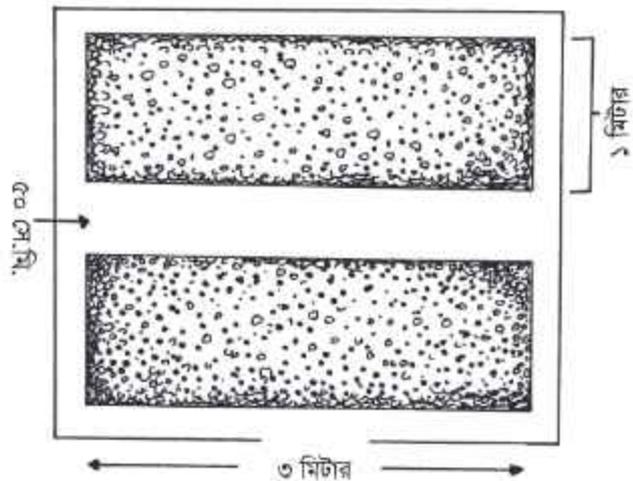
চিত্র : আদর্শ উদ্যান বীজতলা

শাকসবজির বীজ বপনের হার নিম্নের ছক অনুসারে হতে হবে –

৩ বর্গমিটার বীজতলায় বীজ বপনের হার	
সবজির নাম	বীজ বপনের হার (গ্রাম)
ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি	১০ -১২
ওলকপি	১৫-২০
শালগম	১২-১৪
টমেটো	৮-১০
বেগুন	১০-১২
মরিচ	১৮-২৪
লেটুস	৮-১২
পেঁয়াজ	১৮-২৪

পাঠ–৩ : বীজতলা রক্ষণাবেক্ষণ

বীজতলায় বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা উৎপন্ন হয়। কাজেই বীজতলা সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার। নিম্নে সংক্ষেপে বীজতলার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো –

- বীজতলার মাটি সমান রাখতে হবে;
- বীজতলার আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে;
- বীজতলার পোকা ও রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে দমনের ব্যবস্থা করতে হবে;
- দুইটি বেডের মাঝে নালায় সবসময় পানি রাখার জন্য সেচের ব্যবস্থা করতে হবে;
- চারা হলদে দেখালে প্রতি শতক বীজতলার জন্য ২৮০ গ্রাম ইউরিয়া বীজতলায় ছিটাতে হবে;
- বীজতলায় কখনো কাঁচা গোবর প্রয়োগ করা যাবে না;
- ছাগল, ভেড়া ও গরু-বাছুরের আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য চারদিকে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে;
- বীজতলা যাতে বেশি শুকিয়ে না যায় সেদিক লক্ষ্য রেখে ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে;

কাজ : পাঠ মুল্যায়নের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো দলীয়ভাবে সমাধান করতে দলীয় কাজ দেবেন এবং কাজ শেষে দলনেতার মাধ্যমে উপস্থাপন করাবেন।

(১) কোন ধরনের মাটি বীজতলার জন্য উত্তম? (২) বীজতলার স্থান নির্বাচন করতে হলে কোন বিষয়গুলোর প্রতি বেশি দৃষ্টি দেবে? (৩) চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে জায়গার পরিমাণ কীভাবে নির্ধারণ করবে? (৪) বীজতলায় বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন কেন? (৫) বীজতলা স্থাপনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কী?

পাঠ–৪ : জমিতে সার প্রয়োগ

আমরা আগেই সার সম্পর্কে জেনেছি। এখন সার প্রয়োগে নিয়মনীতি অনুসরণ করার সুফল ও অনুসরণ না করার কুফল সম্পর্কে জানব।

ফসল উৎপাদনে সারের বিকল্প নেই। কেননা উদ্ভিদের খাদ্যই হচ্ছে সার। পঞ্চাশের দশকে এদেশের ফসলে রাসায়নিক সার ব্যবহার শুরু হয় আর তখন সার ব্যবহারের কথা বলা হলে চাষিরা চমকে উঠতেন। কৃষিবিভাগের তৎপরতার কারণে এ ভীতি কমে এসেছে। কিন্তু আজও দেখা যায় চাষিরা ফসলের জমিতে সার ব্যবহারের নিয়মনীতি না মেনে অনেকেই পরিমাণের চেয়ে বেশি বা কম সার প্রয়োগ করে থাকেন। কাজেই গাছের বৃদ্ধি, ফুল-ফল ধারণ ও মাটিকে উর্বর রাখতে হলে মাটি পরীক্ষা করে সুষম সার ব্যবহার করতে হবে। কারণ মাটি পরীক্ষা না করে সার ব্যবহার করলে–

(১) একদিকে যেমন উৎপাদন কম হয় অন্যদিকে খরচ বাড়ে (২) এছাড়া মাটির উর্বরতা ও পরিবেশ নষ্ট হয়। আবার, সুষম সার প্রয়োগে–

(১) মাটিতে পুষ্টি উপাদান যোগ হয় (২) মাটি উর্বর হয়

মাটিতে সার ব্যবহারের আগে করণীয়

আমরা এতক্ষণ সারের ব্যবহার সম্পর্কে জানলাম। এসো এবার সার ব্যবহারের আগে করণীয় সম্পর্কে জেনে নেই। বছরের যেকোনো সময় ফসল চাষ করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আগে থেকেই জেনে নিতে হবে–

- মাটি পরীক্ষা করে মাটির গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে হবে। অর্থাৎ মাটিতে কোন পুষ্টি উপাদান কী পরিমাণে আছে তা জানতে হবে।
- পরীক্ষিত মাটিতে কোন ফসল চাষ করা যাবে তা জানতে হবে।
- ফসলভিত্তিক সারের চাহিদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার নির্দেশনা থেকে জেনে নিতে হবে।
- ঐ জমিতে পুর্ববর্তী কী ফসল চাষ করা হয়েছে এবং তাতে কী কী সার ব্যবহার করা হয়েছে তা জানতে হবে।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিমিত সার ব্যবহারের সুফল ও কুফল সম্পর্কে দলীয়ভাবে প্রতিবেদন লিখতে বলবেন। শিক্ষক প্রতিবেদনগুলো সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ–৫ : সার ব্যবহারে সাশ্রয়

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অল্প জমিতে বেশি ফলন পেতে হলে রাসায়নিক সার ব্যবহারের বিকল্প নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- কীভাবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানো যায় এবং পাশাপাশি ফলন বেশি পাওয়া যায়?

প্রয়োগের সময় ও পদ্ধতির উপরই প্রয়োগকৃত সারের কার্যকারিতা বাড়ে। এটি নাইট্রোজেন সারের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পানিতে সহজে দ্রবণীয় বলে কোনো কোনো পরিস্থিতিতে প্রয়োগকৃত নাইট্রোজেনের প্রায় ৭০% নানাভাবে মাটি থেকে ধুয়ে ফসলের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে এবং পরিবেশকেও দূষিত করে। যেমন –

১. ইউরিয়া সার মাটিতে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং মৌসুম শেষে মাটিতে তা একেবারেই অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই ইউরিয়া সার ফসলের চাহিদামাফিক গাছের আংশিক বৃদ্ধির ধাপে ধাপে কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়।

২. জমিতে সবুজ সার তৈরির পর ধানের জমিতে নাইট্রোজেন সারের মাত্রা ১৫-২০ কেজি/হেক্টর কমানো যায়।

৩. শুঁটি জাতীয় দানা ফসল চাষের পর (ফসলের পরিত্যক্ত অংশ মাটিতে মিশিয়ে দিলে) নাইট্রোজেন সারের প্রয়োগ মাত্রা ৮-১০ কেজি/ হেক্টর কমানো যায়।

৪. এলসিসি LCC (Leaf Colour Chart) ব্যবহারের মাধ্যমে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ধানের ফলন ঠিক থাকে এবং হিসেব করে দেখা গেছে রোপা আমন ধানে শতকরা ২৫ ভাগ এবং বোরো ধানে শতকরা ২৩ ভাগ ইউরিয়া সার কম লাগে।

৫. ইউরিয়া সার গুটি আকারে ফসলের জমিতে প্রয়োগ করলে ২৫% ইউরিয়া সাশ্রয় হয়।

সাশ্রয়ীরূপে সার প্রয়োগের পদ্ধতি

এতক্ষণ আমরা সারের ব্যবহার কমানোর উপায়গুলো অর্থাৎ সাশ্রয় সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এবার এসো সাশ্রয়ীরূপে প্রয়োগের নিয়মগুলো জেনে নিই-

১. রাসায়নিক সার কোনো বীজ, গাছের কাণ্ডের খুব কাছাকাছি বা কোনো ভেজা কচিপাতার উপর ব্যবহার করা যাবে না।

২. ধানের কাদাময় জমিতে ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। তবে শুকনো জমিতে প্রয়োগের পর নিড়ানি বা আঁচড়া দিয়ে মাটির সাথে মেশাতে হবে।

৩. জৈব সার, টিএসপি ও এমওপি সার বীজ বপন বা চারা রোপণের ৭ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে।

৪. বেলে মাটিতে এমওপি ও ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে মাটির কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

৫. ধানের চারার প্রথম কুশি (tiller) বের হওয়ার সময়, কচি থোড় জন্মের কয়েকদিন আগে এবং গমে মুকুট শিকড় বের হলে, ভুট্টার চারা যখন হাঁটু সমান উঁচু হয় এবং স্ত্রী ফুল বের হওয়ার এক সপ্তাহ আগে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা দরকার।

৬. ২য় অধ্যায়ে বর্ণিত ধানচাষে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগের নিয়মাবলি অনুযায়ী গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

৭. জমি তৈরির শেষ চাষে পটাশ, গন্ধক ও দস্তা জাতীয় সারগুলো প্রাথমিকভাবে একবারে প্রয়োগ করা যায় ।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে একটি বিতর্কের ব্যবস্থা করবেন। বিতর্কের বিষয়: একমাত্র রাসায়নিক সারের পরিমিত ব্যবহারই ফসলের ভালো ফলন নিশ্চিত করতে পারে ।

পাঠ ৬ : জমিতে সাশ্রয়ীরূপে সেচের ব্যবহার

ফসল উৎপাদনে পানির চাহিদা পূরণে কৃত্রিম উপায়ে পানি প্রয়োগকে পানি সেচ বলে । সেচের পানির মূল উৎস বৃষ্টিপাত । বৃষ্টিপাতের পানি নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর, হ্রদ, পুকুর ইত্যাদিতে জমা হয় বা চলাচল করে । এ সব পানির অংশবিশেষ ভূগর্ভে জমা হয় । সেচের জন্য অবস্থান অনুসারে পানির উৎস দুই প্রকার: ক) ভূউপরিস্থ পানি; যেমন–নদ-নদী, খাল-বিল ইত্যাদির পানি ও খ) ভূগর্ভস্থ পানি । বিভিন্ন ধরনের সেচ প্রযুক্তি যেমন–গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, শক্তিচালিত পাম্প, ভাসমান পাম্প ইত্যাদি ব্যবহার করে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে সেচ দেওয়া হয়। পানি উত্তোলনের পর কাঁচা বা পাকা সেচ নালার মাধ্যমে জমিতে দেওয়া হয় । দেশের মোট কৃষি জমির ৫২ শতাংশ সেচের আওতাভুক্ত । ১৪.৩৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ভূউপরিস্থ সেচ এবং ৩৩.৭৩ লক্ষ হেক্টর জমি ভূগর্ভস্থ সেচের আওতাভুক্ত। আন্তর্জাতিক পানি ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট (IWMI-International Water Management Institute) -এর এক জরিপে দেখা যায় আমাদের দেশে সেচ দক্ষতা ৩০-৩৫ শতাংশ । অর্থাৎ সেচের জন্য দেওয়া পানির ৬৫-৭০ ভাগই অপচয় হয় । সেচপাম্প ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, সেচনালা নির্মাণ ও মেরামত এবং সেচপাম্প পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুৎ, ডিজেল, পেট্রোলের জন্য প্রতি বছর অনেক টাকা খরচ হয় । বোরো ধানের মোট উৎপাদন খরচের ২৮-৩০ শতাংশ সেচের জন্য খরচ হয় । আবার অতিমাত্রায় ভূগর্ভস্থ সেচ পানি ব্যবহারের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে যা পরিবেশগত দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ । সুতরাং মূল্যবান সেচের পানির অপচয় হ্রাস করে জমিতে সাশ্রয়ীরূপে সেচের ব্যবহার বাড়াতে হবে ।

ফসলের চাহিদা অনুসারে জমি থেকে পানি প্রাপ্তি ভালো ফলনের পূর্বশর্ত । জমিতে পানির ঘাটতি দেখা দিলে সেচের মাধ্যমে ফসলের চাহিদা অনুসারে পানি সরবরাহ করতে হয় । প্রয়োজনের বেশি বা কম পানি উভয়ই ফসলের ফলন বৃদ্ধির অন্তরায়। বেশি পানি দিলে অনেক ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে । সুতরাং ফসল সেচ প্রয়োগের আগে সেচের সঠিক সময় ও প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ

সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। বিভিন্ন ফসলের পানির চাহিদা বিভিন্ন। ফসলের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়েও পানির চাহিদার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শস্যে কখন সেচ দিতে হবে তা নানাভাবে নির্ধারণ করা যায়। সব পদ্ধতিই আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। জমিতে সাশ্রয়ীরূপে সেচের ব্যবহারের জন্য নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে–

ক) সেচ নালার ধরন : সেচ নালার বা ক্যানালের মাধ্যমে জমিতে সেচের পানি সরবরাহ করা হয়। মাটির সেচ নালায় পানি পরিবহনে বেশি অপচয় হয়। আবার যদি মাটির সেচ নালা সঠিকভাবে তৈরি করা না হয় তাহলে অপচয় আরও বেশি হয়। জমি থেকে উঁচু করে সেচ নালা তৈরি, নালার দুই পাশ ও তলা পিটিয়ে মজবুত করলে সরবরাহের সময় সেচের পানির অপচয় হ্রাস পায়।

খ) সেচ পদ্ধতি : ফসলের প্রকার, ভূমির বন্ধুরতা, মাটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের সেচ পদ্ধতি রয়েছে। নিচে পানি সাশ্রয়ী কয়েকটি সেচ পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. চেক বেসিন পদ্ধতি : প্লাবন সেচপদ্ধতিতে জমিতে পানি নিয়ন্ত্রণের কোনো সুযোগ থাকে না। ফলে পানির অপচয় বেশি হয়। এ অসুবিধা দূর করার জন্য চেক বেসিনপদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। চেক বেসিন বা আইল সেচপদ্ধতিতে সমস্ত জমিকে ঢাল অনুসারে কয়েকটি খণ্ডে উঁচু আইল দ্বারা বিভক্ত করে পানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সেচ দেওয়া যায়।

২. রিং বেসিনপদ্ধতি : ফল বাগানে রিং বেসিন বা বৃত্তাকার পদ্ধতিতে সেচ দিলে পানির অপচয় কম হয়। এ পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি ফল গাছের গোড়ায় বৃত্তাকার নালা তৈরি করে প্রধান সেচ নালার সাথে সংযোগ দেওয়া হয়।

৩. নালা পদ্ধতি : নালা সেচ পদ্ধতিতে জমির আয়তন অনুসারে পর্যাপ্ত সংখ্যক নালা তৈরি করে প্রধান সেচ নালার সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। সারি ফসলে এ পদ্ধতি বেশি উপযোগী। এ পদ্ধতিতে পানিনিয়ন্ত্রণ সহজ বলে অপচয় কম হয়।

৪. বর্ষণ সেচপদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে নজলের মাধ্যমে পানি গাছের উপর বৃষ্টির মতো ছিটিয়ে দেওয়া হয়। পানি সাশ্রয়ী এ পদ্ধতিতে প্রাথমিক খরচ বেশি। চা বাগানে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

৫. ড্রিপ সেচপদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে পানি পাইপের মাধ্যমে গাছের মূলাঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া হয়। এটা সবচেয়ে পানি সাশ্রয়ী পদ্ধতি। যেখানে সেচের পানির খুব অভাব সেখানে এ পদ্ধতি বেশি কার্যকর।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে অতিরিক্ত সেচের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করবে। আলোচনা শেষে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

গ) সেচের পানির পরিমাণ : গাছ মূলাঞ্চল হতে পানি গ্রহণ করে। গাছের বৃদ্ধির সাথে মূল বৃদ্ধি পায় ও মাটির গভীরে প্রবেশ করে। তাই সেচের মাধ্যমে গাছের মূলাঞ্চল ভিজাতে হয়। বেশির ভাগ ফসলের ৮০-৯০ শতাংশ মূল উপরের প্রথম এক থেকে দেড় ফুট মাটির গভীরে থাকে। গাছের মোট পানির ৭০ শতাংশ মূলাঞ্চলের প্রথমার্ধ থেকে গ্রহণ করে। তাই মাটির প্রথম এক থেকে দেড় ফুট গভীরতা পর্যন্ত ভিজিয়ে পানি সেচ দিতে হবে।

ঘ) সেচ দেওয়ার সময় : সেচের পানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য সঠিক সময়ে সেচ দিতে হবে। সঠিক সময়ে সেচ দেওয়ার জন্য দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়–

১. মাটিতে রসের অবস্থা : মাটিতে রসের অবস্থা বুঝে জমিতে সেচ দিতে হবে। জমিতে রসের পরিমাণ জানার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। সহজ একটি পদ্ধতি হলো হাতের সাহায্যে অনুভব করে মাটির রসের অবস্থা বুঝে সেচ দেওয়া। যে জমিতে সেচ দিতে হবে ঐ জমির একটি স্থানে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের গভীরতা ফসলের শিকড়ের গভীরতার তিন ভাগের দুই ভাগের সমপরিমাণ হবে। এবার গর্তের তলা থেকে মাটি তুলে হাতের মুঠোয় নিয়ে চাপ দিয়ে গোলাকার বল তৈরি করতে হবে। যদি মাটি শুকনা ও ধুলা হয়, বল তৈরির সময় আঙুলের ফাঁক দিয়ে গুঁড়ো হয়ে বের হয়ে যায় বা বল তৈরি হলেও তা ফেলে দিলে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়, তাহলে জমিতে অতি সত্বর সেচ দিতে হবে। মাটি হাতের মুঠোয় নিয়ে চাপ দিলে দলা হবে কিন্তু ফেলে দিলে দলা ভাঙবে না, এমন অবস্থায় ১-২ দিন পর জমিতে সেচ দিতে হবে। মাটি হাতের মুঠোয় নিয়ে চাপ দিলে ভিজা দলা তৈরি হবে, হাতের তালু ভিজে যাবে এবং দলা ফেলে দিলে ভাঙবে না, এ অবস্থায় ৩-৪ দিন পর পুনরায় মাটির রস পরীক্ষা করতে হবে। আর যদি মাটি কাদাময় হয়, হাতে চাপ দিলে কাদা মাটি আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে, তালু ভিজে যায় কিন্তু পানি বেরিয়ে আসে না, এমতাবস্থায় সেচ দিতে হবে না। ৭ দিন পর জমি আবার পরীক্ষা করতে হবে।

২. ফসলের বৃদ্ধি পর্যায় : ফসলের শারীরতাত্ত্বিক বৃদ্ধির সকল পর্যায়ে সমানভাবে পানির প্রয়োজন হয় না। যে সকল পর্যায়ে মাটিতে পানি স্বল্পতায় ফসলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় তাকে সেচের প্রতি সংবেদনশীল পর্যায় বলে। আর যেসব পর্যায়ে পানির অভাবে ফসলের ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায় তাকে সংকটময় পর্যায় বলে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিষয় শিক্ষকের সহায়তায় জমিতে সাশ্রয়ীরূপে সেচ ব্যবহারে বিবেচ্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে পোস্টার তৈরি করবে।

নিচের ছকে প্রধান প্রধান ফসলের সেচের প্রতি সংবেদনশীল ও সংকটময় পর্যায়সমূহ দেখানো হলো-

ফসলের নাম	সেচের প্রতি সংবেদনশীল পর্যায়	সেচের প্রতি সংকটময় পর্যায়
ধান	প্রাথমিক কুশি গজানো, শীষ গজানো, পুষ্পায়ন, দুধ পর্যায়	প্রাথমিক কুশি গজানো, পুষ্পায়ন
গম	মুকুট মূল গজানো, কুশি গজানোর শেষ দিকে, পুষ্পায়ন	পুষ্পায়ন, মুকুট মূল গজানো
সরিষা	দৈহিক বৃদ্ধি ও পুষ্পায়ন	পুষ্পায়ন
ছোলা	পুষ্পায়ন-পূর্ব ও বীজ গঠন	পুষ্পায়ন-পূর্ব
আলু	চারা গজানো, স্টোলন তৈরি, প্রাথমিক কন্দ গঠন, কন্দের ওজন অর্জন পর্যায়	চারা গজানো, প্রাথমিক কন্দ গঠন

ফসলের সেচের প্রতি সংবেদনশীল ও সংকটময় পর্যায়ে জমিতে রসের ঘাটতি হলে সেচ দিতে হবে। এভাবে সেচ দিলে অতিরিক্ত সেচের প্রয়োজন হবে না।

ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। দেশের মোট জমির প্রায় ৭৫ শতাংশ জমিতে ধান চাষ হয়। বোরো মৌসুমে সবচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন হয়। আর এ মৌসুম বৃষ্টিহীন থাকায় সবচেয়ে বেশি পানি সেচের প্রয়োজন হয়। প্রচলিত সেচ পদ্ধতিতে ধানের জমিতে ১০-১৫ সে.মি. দাঁড়ানো পানি রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে ৩০০০-৫০০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয় যা প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। বর্তমানে ধান চাষে পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি হিসেবে পর্যায়ক্রমিক ভেজানো ও শুকানো (Alternate Wetting and Drying) পদ্ধতি জনপ্রিয় করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে সব সময় জমিতে দাঁড়ানো পানির প্রয়োজন নেই। জমিতে একটি পর্যবেক্ষণ নল স্থাপন করে সেচের সময় নির্ধারণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে পানি, জ্বালানি, ও শ্রমিক খরচ সাশ্রয় হয়। ৩০-৩৭ ভাগ সেচের পানি কম লাগে, ২৯ ভাগ ডিজেল কম লাগে এবং ধানের ফলন ১২ ভাগ বেশি হয়। সর্বোপরি এটি একটি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি।

কাজ : শিক্ষার্থীরা জমিতে অতিরিক্ত সেচের প্রভাবে কী ক্ষতি হতে পারে সে সম্পর্কে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : ভূউপরিস্থ পানি, ভূগর্ভস্থ পানি, সেচ দক্ষতা, চেক বেসিনপদ্ধতি, বর্ষণ সেচপদ্ধতি, ড্রিপ সেচপদ্ধতি, গাছের মূলাঞ্চল, সেচের প্রতি সংবেদনশীল ও সংকটময় পর্যায়।

পাঠ ৭ : ভালো উন্নত বীজ নির্বাচন

বীজ একটি মৌলিক কৃষি উপকরণ। বীজের মাধ্যমে উদ্ভিদের বংশ বিস্তার ঘটে। উদ্ভিদ বিজ্ঞান অনুযায়ী নিষিক্ত ও পরিপক্ব ডিম্বককে বীজ বলে। আমরা জানি উদ্ভিদের অন্যান্য অঙ্গ ব্যবহার করেও বংশ বিস্তার সম্ভব। কৃষিতত্ত্ব এগুলোকেও বীজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কৃষিবিদগণ এগুলোকে কৃষিতাত্ত্বিক বীজ বলেন আর নিষিক্ত পরিপক্ব ডিম্বককে বলা হয় সত্যিকার বীজ (true seed) বা উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ (sexual seed)। বীজের মাধ্যমে উদ্ভিদের জাতের গুণাগুণ পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। অঙ্গজ প্রজননে মাতৃ উদ্ভিদের অর্থাৎ যে উদ্ভিদের অঙ্গ ব্যবহার করা হলো তার গুণাগুণ পরবর্তী বংশধরে প্রকাশ ঘটতে পারে। অপর দিকে যৌন বীজে মাতা ও পিতা উদ্ভিদ উভয়ের গুণের একটি যৌক্তিক মিশ্রণ নিয়মানুসারে ঘটে। এ ক্ষেত্রে অসুবিধা এই যে স্বপরাগায়ন (self fertilized) না হলে, মা গাছের সকল গুণাগুণ পরবর্তী প্রজন্মে নাও পাওয়া যেতে পারে। তবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে দুইটি আলাদা জাতের (একই ফসলের) মধ্যে সংকরায়ণ (hybridization) ঘটিয়ে তৃতীয় জাত তৈরি করা যায় যাতে মাতার কিছু এবং পিতার কিছু ভালো গুণের সমাহার ঘটতে পারে। এইভাবে বীজের বংশগতিগত (genetic) উন্নয়ন সম্ভব, যাকে বলা হয় সংকরায়ণ।

কৃষক চাষাবাদের জন্য উন্নত গুণাগুণসম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতের উন্নত বীজ ব্যবহার করে লাভবান হতে চায়। কৃষি গবেষণা সংস্থাগুলো বীজ উন্নয়নের কাজ করে, বীজ প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ উন্নতজাতের বীজের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় এবং Banglades Agricultural Development Corporation (BADC) এর মতো রাষ্ট্রীয় কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বিভিন্ন স্বীকৃত প্রতিনিধির মাধ্যমে কৃষকদের উন্নত বীজ সরবরাহ করে।

চলতি কোনো ফসলের জাতের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কিছু কাঙ্ক্ষিত গুণের ভিত্তিতে ক্রমাগত বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও বীজের উন্নতি বা জাতের উন্নতি ঘটানো যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে উন্নয়নকে বলা হয় চয়ন-প্রজনন (selection breeding)। পর্যবেক্ষণ ও বাছাই এখানে মূল কৌশল। সংকরায়ণের পরও বেশ কয়েক প্রজন্ম (generation) পর্যবেক্ষণ ও বাছাই করা হয়।

চাষি পর্যায়ে উন্নত বীজ নির্বাচনের আগে আরও কিছু বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়। যেমন-

- চাষির কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের জন্য ফসলের কোন কোন জাত উপযুক্ত।
- ঐ জাতগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে কম সময়ে ফলন দেয়।
- ঐ জাতগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে বেশি ফলন দিতে পারে।
- কোন জাতটির রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলক বেশি।
- কোন জাতটির মাঠ পরিচর্যা সহজতর।

যদিও উচ্চ ফলনশীলতা উন্নত জাতের একটি বিশেষ গুণ। কিন্তু উন্নত জাতের বীজ হলেই উচ্চ ফলন পাওয়া নিশ্চিত হয় না, চাষির প্রয়োজন উন্নত জাতের ভালো বীজ। ভালো বীজের আরও কিছু ভালো গুণ থাকা প্রয়োজন যেমন-

- মিশ্রণহীন বীজ
- অন্তত ৮০% অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন
- চারার উচ্চমানের সতেজতা
- পরিচ্ছন্নতা
- সুস্থ বীজ (রোগজীবাণুর দূষণ ও সংক্রমণমুক্ততা)

সহজাতের ও বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে বীজের উল্লিখিত গুণগুলো আছে কি না তা নির্ধারণ করা যায়। এই গুণগুলোর ঘাটতি থাকলেও যে কোনো বীজও উচ্চ ফলন দিতে ব্যর্থ হয়। তাই উন্নত ভালো বীজ নির্বাচন উচ্চ ফলন পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। বীজের অঙ্কুরোদগম এবং চারার সতেজতা পরীক্ষা :
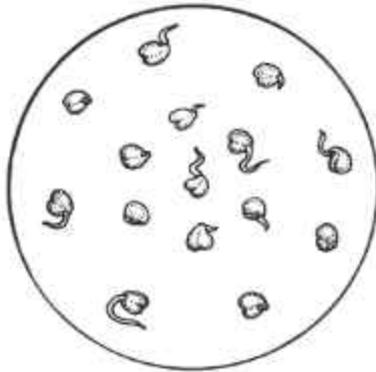
চিত্র : ব্লটার পরীক্ষা
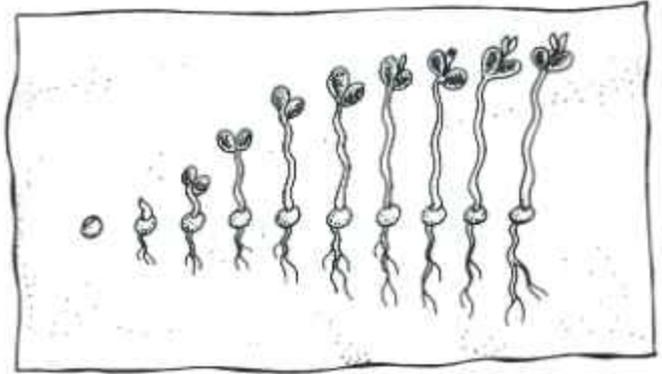
চিত্র : পেপার টাওয়েল পরীক্ষা

উপরের চিত্রের ব্লটার পরীক্ষা এবং পেপার টাওয়েল পরীক্ষার মাধ্যমে বীজের অঙ্কুরোদগম এবং চারার সতেজতা নির্ণয় করা যায়। ব্লটার পরীক্ষায় একটি পেট্রিডিসের মধ্যে ব্লটিং পেপার বিছিয়ে পানি দিয়ে বীজ স্থাপন করে উপযুক্ত পরিবেশে রেখে বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা করা হয়। একই ভাবে একটি ট্রের মধ্যে কয়েক স্তর নিউজপেপার বিছিয়ে পানি দিয়ে ভিজিয়ে বীজ স্থাপন করে অঙ্কুরোদগম ঘটানো হয়। কয়েকদিন রেখে চারাগুলোর বৃদ্ধি পরীক্ষা করে বীজের তেজ বা চারার সতেজতা নির্ণয় করা যায়। অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা এবং চারার সতেজতা শতকরা হারে নির্ণয় করা যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা উন্নত ও সুস্থ বীজ নির্বাচন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে দলগতভাবে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করবে।

পাঠ-৮ : বীজ সংরক্ষণ

উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে ভালো বীজও খারাপ হয়ে যেতে পারে। বাস্তবে সংরক্ষণ বিষয়টি সত্যিকারের বীজের ক্ষেত্রে বেশি প্রাসঙ্গিক। সঠিক কৌশলে বীজ সংরক্ষণ করলে ভালো বীজের যে গুণাগুণগুলো পূর্ববর্তী পাঠে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো অক্ষুণ্ন রেখে কয়েক বছর ব্যবহার করা যায়।

উন্নত বীজ সংরক্ষণ কৌশল : বীজ ফসল (seed crop) নির্বাচন মাঠে থাকতেই শুরু করতে হয়। বীজ ফসল মাঠে থাকতেই সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে বীজ ফসলে রোগ সংক্রমণ না হয় এবং অন্য কোনো বালাই আক্রান্ত না হয়। পরিপক্ব হওয়া মাত্র এই বীজ সংগ্রহ করে ঝাড়া, বাছা ও শুকানো এমন যত্ন সহকারে করা উচিত যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। খোলা বাতাসে রৌদ্রে শুকানো যেতে পারে। প্রত্যেক ফসলের জন্য বীজ শুকানোর আলাদা মান থাকতে পারে। অর্থাৎ বীজের আর্দ্রতার নির্দিষ্ট নিরাপদ মাত্রা রয়েছে। ধান, গম বীজের জন্য এই আর্দ্রতার মাত্রা ১০-১২%, বীজ খুব বেশি শুকালে ভঙ্গুর হয়ে পড়তে পারে এবং বীজের ভ্রূণের ক্ষতি হতে পারে। আবার বীজ নিরাপদ আর্দ্রতার মাত্রার কম শুকালে সহজেই জীবাণু সংক্রমণ ঘটতে পারে এবং পোকার আক্রমণ ঘটতে পারে। তাছাড়া অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে শ্বসন দ্রুত হওয়ায় দ্রুত বীজের সজীবতা (viability) ও সতেজতা (vigour) কমে যেতে পারে এবং গুদামে সংরক্ষণ অবস্থায় বীজ অঙ্কুরিত হয়ে যেতে পারে।

গুদামজাত বীজ কতটা এবং কত সময় ভালো থাকবে তার উপর আর্দ্রতা নিয়ামক প্রভাব রাখে। বীজের আর্দ্রতা ছাড়াও যে পাত্রে বীজ রাখা হবে তার অভ্যন্তরের এবং যে গুদামে বীজভরা পাত্রগুলো রাখা হবে তার অভ্যন্তরীণ আর্দ্রতাও প্রভাব রাখতে পারে। তবে যদি বীজ রাখার পাত্রটি এমন হয় যার ভিতরে বায়ু প্রবেশ করতে বা বের হতে না পারে তাহলে ভালো বীজ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

আর্দ্রতা ছাড়া যে সকল প্রভাবক বীজের ক্ষতি করতে পারে সেগুলো হলো উচ্চ তাপ, তীব্র রশ্মি ইত্যাদি। তবে বায়ুরোধক পাত্রে উপযুক্ত মাত্রায় শুকানো বীজ রাখলে এগুলোর প্রভাব তেমন পড়ে না। তবু পাত্রে সংগৃহীত বীজ অন্ধকার শীতল জায়গায়, ইঁদুর, পোকামাকড়, এসবের উপদ্রব থেকে সুরক্ষিত স্থানে গুদামজাত করা উচিত। হিমাগারে বীজপাত্র রাখা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে কোল্ড স্টোরের ভিতর আলাদা এলাকা নির্দিষ্ট থাকা দরকার। সংরক্ষিত বীজের পরিমাণ কম হলে (যেমন-শাকসবজি, ফুলের বীজ) বীজের প্যাকেট বা কৌটার গায়ে পরিচয় লিখে রেফ্রিজারেটরে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণের জন্য বীজ সংগ্রহের আগেই জেনে নিতে হবে ঐ বীজ থেকে নতুন ফসল হবে কি না।

পাঠ- ৯ : মাটি শোধনকারি ধানবীজ সংরক্ষণের ধাপ

১। বীজের জন্য ধান পৃথক প্লটে বিশেষ পরিচর্যায় উৎপাদন করা ভালো। এই প্লটে নির্ধারিত পরিমাণে মাটি শোধনকারি বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে এবং কঠোর স্বাস্থ্যব্যবস্থা (sanitation) পালন করতে হবে।

২। ধান পাকা মাত্রই তা কম খড়সহ যত্নের সাথে শুকাতে হবে, আঁটি বেঁধে মাড়াইখোলায় নিয়ে আসতে হবে এবং সম্ভব হলে ঐ দিনই মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকানো শুরু করতে হবে।

৩। বীজ ধান ঠিকমতো শুকানো হলো কি না দাঁতে কেটে পরীক্ষা করা যায়। দাঁতে একটি ধান কাটতে গেলে যদি ধান দাঁতে বসে যায়, তাহলে আরও শুকাতে হবে। শুকানো ধান দাঁতে কাটতে গেলে কট শব্দ করে ভেঙে যাবে। এ ছাড়া বীজ ধানের স্তূপে বীজের আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েও বীজের আর্দ্রতা মাপা যায়।

চিত্র : ড্রামে রাখা বীজ

৪। বীজ পাত্রে সংরক্ষণের আগে ছায়াযুক্ত স্থানে কিছুক্ষণ রেখে ঠান্ডা করে নেওয়া প্রয়োজন।

৫। বীজপাত্র পূর্ণ করে বীজ রাখা ভালো।

৬। বীজপাত্রের গায়ে বীজের পরিচয়, পাত্রস্থ করার তারিখ, কোনো রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার হয়েছে কি না, যিনি বীজ সংরক্ষণ করলেন তার স্বাক্ষর দেওয়া প্রয়োজন।

মরিচের বীজ সংরক্ষণের ধাপ

১। সুস্থ, সবল গাছ থেকে সতেজ, রোগ লক্ষণহীন পাকা মরিচ পরিমাণ মতো সংগ্রহ করতে হবে।

২। সতেজতা থাকতেই মরিচগুলো ভেঙে পরিষ্কার পাত্রে সাবধানে বীজ বের করে নিতে হবে যাতে বীজ ছিটকে চোখে না লাগে।

৩। সংগ্রহ করা বীজগুলোর মধ্যে অপুষ্ট, রোগ লক্ষণযুক্ত, অস্বাভাবিক বীজ থাকলে তা বাছাই করে ফেলে ঐ পাত্রেই রোদে শুকাতে হবে। প্রচণ্ড রোদে ২ ঘণ্টা শুকালেই যথেষ্ট। এক ঘণ্টা পর একটি কাঠি বা চামচ দিয়ে নেড়ে দেওয়া ভালো।

৪। শুকানোর পর পাত্রে রাখার আগে বীজ ঠান্ডা করে নিতে হবে। অল্প বীজ সংরক্ষণের জন্য জিপারযুক্ত প্লাস্টিক ব্যাগ সর্বোত্তম। এটি পাওয়া না গেলে পলিথিন ব্যাগে নিয়ে ব্যাগ সিল করে দিতে হবে।

৫। বীজের প্যাকেটগুলোতে লেবেল লাগাতে হবে।

৬। ছোটো ছোটো বীজের প্যাকেটগুলো একটি বড় স্বচ্ছ বয়ামে ভরে নিরাপদ শুকনো ঠান্ডা স্থানে রাখতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সাধারণত ফল বাগানে কোন ধরনের সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?

ক. চেক বেসিন
খ. রিং বেসিন
গ. বর্ষণ বেসিন
ঘ. ড্রিপ বেসিন

২. ধান চাষে সেচের প্রতি সংবেদনশীল পর্যায়-

i. পুষ্পায়নের সময়
ii. শীষ গজানোর সময়
iii. বীজ গঠনের সময়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পলাশ নার্সারি তৈরির উদ্দেশ্যে ভালুকায় তার গ্রামের বাড়িতে ১০টি বেড তৈরি করেন। বেড তৈরির সময় তিনি জৈব রাসায়নিক সার ব্যবহারের পাশাপাশি চুন প্রয়োগ করেন।

৩. তৈরিকৃত বেডের জন্য কত কেজি এমওপি সার প্রয়োজন?

ক. ১ কেজি
খ. ২ কেজি
গ. ৩ কেজি
ঘ. ৪ কেজি

৪. বেডে চুন প্রয়োগের কারণ হচ্ছে-

i. মাটির অম্লত্ব নিয়ন্ত্রণ

ii. রোগজীবাণু দমন

iii. বীজ দ্রুত গজানো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মোরশেদ মিয়া এলাকায় একজন সচেতন ও সফল চাষি হিসেবে পরিচিত। তিনি সব সময়ই আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছেন। তিনি এ বছর ৪ হেক্টর জমিতে সবুজ সার তৈরির পর ধানের চাষ করেন এবং ইউরিয়া ব্যবহারে এল সি সি পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

ক. কোন ধরনের মাটিতে ধানের শুকনো বীজতলা তৈরি করা হয়?

খ. চাষ দেওয়ার পর বীজতলা ২-৪ দিন ফেলে রাখতে হয় কেন ব্যাখ্যা কর?

গ. মোরশেদ মিয়া তার জমিতে কী পরিমাণ ইউরিয়া সার কম ব্যবহার করবেন তা নির্ণয় কর।

ঘ. ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে মোরশেদ মিয়ার কার্যক্রম মূল্যায়ন কর।

২. কবীর সাহেব দীর্ঘদিন ধরে জমিতে সেচের মাধ্যমে ধানের চাষাবাদ করে আসছেন। বর্তমানে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় ফসলের উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় কবীর সাহেব কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করেন। কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ মতে কবীর সাহেব মাটি পরীক্ষা করে সেচের সময় নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে তার জমিতে পানির পরিমাণ অনেক কম লাগে।

ক. সেচের পানির মূল উৎস কোনটি?

খ. ভালোবীজ নির্বাচন করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. কবীর সাহেব তার জমিতে সেচের সময় কীভাবে নির্ধারণ করবেন, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ফসলের উৎপাদন খরচ কমাতে কবীর সাহেবের উদ্যোগটি মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষি ও জলবায়ু

এ অধ্যায়ে প্রথমে প্রতিকূল পরিবেশ কী? প্রতিকূল পরিবেশে কৃষি উৎপাদনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে প্রতিকূল পরিবেশ যেমন– খরা, লবণাক্ত ও বন্যাপ্রবণ এলাকার শস্য, মৎস্য ও পশুপাখির উৎপাদন কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ফসল উৎপাদনে বিরূপ আবহাওয়া যেমন– জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি থেকে শস্য, মৎস্য ও পশুপাখি রক্ষার কৌশল ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।
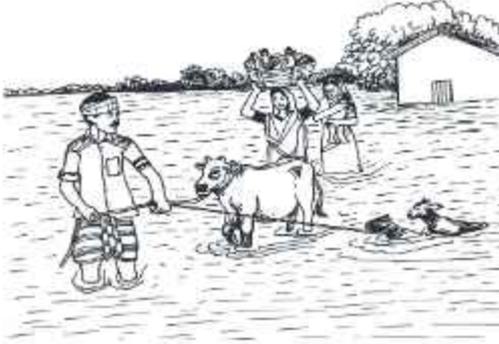
চিত্র : বন্যা

চিত্র : শিলাবৃষ্টি
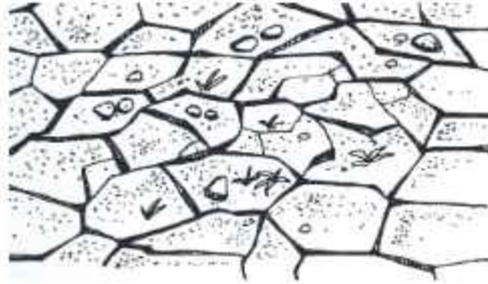
চিত্র : খরা

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- প্রতিকূল পরিবেশে কৃষিজ উৎপাদনের কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- বিরূপ আবহাওয়া থেকে কৃষি উৎপাদনকে রক্ষায় কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহারের কৌশল বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ ১ : ফসল উৎপাদনে প্রতিকূল পরিবেশ

জলবায়ু ও পরিবেশগত উপাদান স্বাভাবিক থাকলে ফসলের বৃদ্ধি ও বিকাশ স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। তবে প্রকৃতি সব সময় স্বাভাবিক থাকে না। কিছু কিছু অঞ্চলে উৎপাদন মৌসুমে ফসলকে জলবায়ু ও পরিবেশগত নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এ অবস্থাকে প্রতিকূল পরিবেশ বলে। এ ধরনের অবস্থায় ফসল জৈব-রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। একে ফসলের অভিযোজন ক্ষমতা বলে।

আমরা জানবো জলবায়ু ও পরিবেশের কোন উপাদানগুলো ফসল উৎপাদনের জন্য প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে। প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টিকারী জলবায়ুগত উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- বন্যা বা জলাবদ্ধতা
- অনাবৃষ্টি বা খরা
- উচ্চতাপ
- নিম্নতাপ

আর পরিবেশগত উপাদানের মধ্যে রয়েছে–

- মাটির লবণাক্ততা
- মাটিতে বিষাক্ত রাসায়নিকের উপস্থিতি
- বাতাসে বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতি
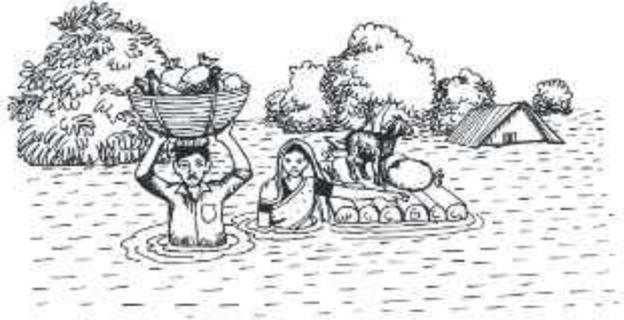
চিত্র : বন্যা

বাংলাদেশের কৃষিতে প্রতিকূল পরিবেশজনিত সমস্যা অনেক আগে থেকেই ছিল। বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতিকূল পরিবেশজনিত সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের কৃষি খাতে ৩টি আশঙ্কাজনক ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে–

- খরা
- লবণাক্ততা
- বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃষ্টিপাত অনিয়মিতভাবে হচ্ছে। বোরো মৌসুমে এবং আমন মৌসুমে খরার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃষ্টিনির্ভর আমন মৌসুমে সাধারণত চাষিদের সেচ দেওয়ার কোনো পূর্বপ্রস্তুতি থাকে না। ফলে নীরব খরায় ধানের ফলন হ্রাস পাচ্ছে।

বরিশাল ছিল একসময় শস্যভাণ্ডার। এখন সেই বরিশাল খাদ্য ঘাটতি এলাকা। মাটি ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১০ লাখ হেক্টর আমন আবাদি জমি চাষের

অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছর বন্যা হয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো বছর ভয়াবহ বন্যার কারণে ব্যাপক ফসলহানি হয়ে থাকে। ১৯৯৮ সালে এ দেশে দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ বন্যায় তিন লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হ্রাস পায়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট বন্যায় বোরো ধান পাকার সময় তলিয়ে যায়। আবার দেশের মধ্যাঞ্চলের বিস্তৃত অঞ্চলে আমন ধান রোপণের সময় বা রোপণ পরবর্তী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভয়াবহ বন্যায় ২০০৭ সালে দেশের প্রায় ৬০% এলাকা প্লাবিত হয় এবং ৮ মিলিয়ন হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়। বন্যায় আমন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠার আগেই আবার আঘাত হানে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। ফসল উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় ১৩ লক্ষ টন। এছাড়াও ২০০৪ সালে বন্যায় ১.৩ মিলিয়ন হেক্টর, ২০০৭ সালে বন্যায় ৮.৯ মিলিয়ন হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়। সর্বশেষ ২০২৪ সালে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ফেনী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি ও নোয়াখালি জেলা ব্যাপক বন্যাকবলিত হয়।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশে প্রতি বছর অন্তত ১% হারে আবাদি জমি কমে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে ১.৩৯% হারে জনসংখ্যা বাড়ছে। অন্যদিকে প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলাও করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে আমাদের প্রতিকূল পরিবেশে ফসল উৎপাদনের কলাকৌশল জানতে হবে।

কাজ : একক কাজ হিসেবে প্রতিকূল পরিবেশে ফসল উৎপাদনের গুরুত্ব খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

পাঠ ২ : খরা অবস্থায় ফসল উৎপাদন কৌশল

ফসল উৎপাদনে প্রাকৃতিক বিপত্তিসমূহের মধ্যে খরা অন্যতম। বাংলাদেশে প্রায় সব মৌসুমেই ফসল খরায় কবলিত হয়। খরা অবস্থা তখনই বিরাজ করে যখন কোনো নির্দিষ্ট মৌসুমে বৃষ্টিপাত কম হয় বা দীর্ঘদিন ধরে কোনো বৃষ্টিপাত হয় না। এতে করে মাটিতে রসের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য দেহে প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি অবস্থা বিরাজ করে। এ অবস্থাকে খরাকবলিত অবস্থা বলা হয়। খরার কারণে ফসলের ১৫-৯০ ভাগ ফলন হ্রাস পেতে পারে। খরা কবলিত অঞ্চলে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল চাষ করলে লাভজনকভাবে ফসল উৎপাদন করা যায়। ব্যবস্থাপনাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

১. উপযুক্ত ফসল বা ফসলের জাত ব্যবহার : খরা শুরু হওয়ার আগেই ফসল তোলা যাবে এমন স্বল্পায়ু জাতের অথবা খরা সহ্য করতে পারে এমন জাতের চাষ করতে হবে, যেমন– আমন মৌসুমে বিনা ধান৭,

ব্রি ধান ৩৩ এক মাস আগে পাকে। ফলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের খরা থেকে ফসল রক্ষা করা যায়। আবার আমন মৌসুমের ব্রি ধান ৫৬, ব্রি ধান ৫৭ যেমন স্বল্পায়ু জাত তেমন ২১-৩০ দিন খরা সহ্য করতে পারে।

বিজয়, প্রদীপ ও সুফী হলো গমের তিনটি খরা সহনশীল জাত। খরাপ্রবণ এলাকায় আগাম জাতের আমন চাষ করে ফসল কাটার পর জমিতে রস থাকতেই ছোলা, মসুর, খেসারি, সরিষা, তিল ইত্যাদি খরা সহনশীল ফসল চাষ করে একটি অতিরিক্ত ফসল তোলা যাবে। কুল গাছ খরা সহনশীল বলে এসব অঞ্চলে কুল বাগানও করা যেতে পারে।

২. মাটির ছিদ্র নষ্টকরণ : খরাপ্রবণ এলাকায় বৃষ্টির মৌসুম শেষ হওয়ার পর মাটিতে জো আসার সাথে সাথে অগভীর চাষ দিয়ে রাখতে হবে। এতে মাটির উপরিভাগের সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে সূর্যের তাপে মাটির রস শুকিয়ে যাবে না।

৩. অগভীর চাষ : জমি চাষের সময় মাটির আর্দ্রতা কম মনে হলে জমিকে হালকা চাষ দিতে হবে। প্রতি চাষের পর মই দিয়ে মাটিকে আঁটসাঁট অবস্থায় রাখতে হবে। এতে মাটিতে পানির সাশ্রয় হবে।

৪. জাবড়া প্রয়োগ মালচিং : শুকনা খড়, লতাপাতা, কচুরিপানা দিয়ে বীজ বা চারা রোপণের পর মাটি ঢেকে দিলে রস সংরক্ষিত থাকে। কারণ সূর্যের তাপে পানি বাষ্পে পরিণত হতে পারে না। অনেক দেশে কালো পলিথিনও ব্যবহার করা হয়। এতে আগাছার উপদ্রবও কম হয়।

৫. পানি ধরা : যে অঞ্চলে বৃষ্টি খুব কম হয়, সে অঞ্চলে বৃষ্টির মৌসুমে জমির বিভিন্ন স্থানে ছোটো ছোটো নালা বা গর্ত তৈরি করে রাখা হয়। এর ফলে পানি গড়িয়ে জমির বাইরে চলে যায় না। পানি সংরক্ষণের এ পদ্ধতিকে পানি ধরা বলা হয়। বৃষ্টির মৌসুম শেষ হওয়ার সাথে সাথে জমি চাষ দিয়ে ফসল বুনে সংরক্ষিত এ পানি সফলভাবে ব্যবহার করা যায়।

চিত্র : জাবড়া প্রয়োগ
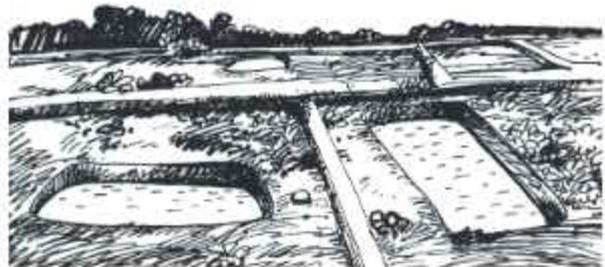
চিত্র : পানি ধরা

৬. আঁচড়ানো : মাটির রস দ্রুত শুকিয়ে যেতে থাকলে বীজ গজানোর পর পর উপরের মাটি হালকা করে আঁচড়ে দিলে মাটির ভিতরে রস সংরক্ষিত থাকে।

৭. সারির দিক পরিবর্তন : খরাপ্রবণ এলাকায় সূর্যালোকের বিপরীত দিকে সারি করে ফসল লাগানো উচিত। এতে গাছ একটু বড়ো হলে ফসলের ছায়া দুই সারির মাঝে পড়ে। ফলে মাটিস্থ পানির বাষ্পীভবন কম হয়। পানির অপচয় কম হয়।

৮. জৈবসার ব্যবহার : জমিতে বেশি করে জৈবসার ব্যবহার করলে মাটির গঠন উন্নত হয়, মাটি ঝুরঝুরে হয়। ফলে মাটির পানিধারণ ক্ষমতা বেড়ে যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে খরা এড়াতে সক্ষম বা খরা সহনশীল ফসলের জাতের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : খরা সহনশীল, জাবড়া প্রয়োগ, পানি ধরা।

পাঠ ৩ : লবণাক্ত অঞ্চলে ফসল উৎপাদন কৌশল

আমরা প্রথম পাঠে জানতে পেরেছি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা একটি বড়ো সমস্যা। আমরা জানি সমুদ্রের পানি লবণাক্ত। এ অঞ্চলের জমি সমুদ্রের পানি দ্বারা প্লাবিত হয়। যার কারণে মাটিতে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের ক্লোরাইড ও সালফেট লবণের পরিমাণ বেড়ে যায়। মাটিতে লবণের ঘনত্ব বেড়ে গেলে ফসলের মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান ও পানি শোষণ বাধাগ্রস্ত হয়। ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানিতে লবণ ধুয়ে যায় বলে লবণাক্ততা একটু কম থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততা আরও বেড়ে যায়। কারণ শুষ্ক মৌসুমে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পানির সাথে লবণ উপরে উঠে আসে।

অনেক এলাকায় মাটির উপরিভাগে লবণের আস্তর পড়ে যায়। নিচে লবণাক্ত মাটিতে ফসল উৎপাদন কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের চাষ : লবণাক্ত অঞ্চলে চাষের জন্য আমাদের লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত নির্বাচন করতে হবে। উত্তম লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলগুলো হলো– নারিকেল, সুপারি, সুগার বিট, তুলা, শালগম, ধৈঞ্চা, পালংশাক ইত্যাদি। মধ্যম লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলগুলো হলো– আমড়া, মিষ্টি আলু, মরিচ, বরবটি, মুগ, খেসারি, ভুট্টা, টমেটো, পেয়ারা ইত্যাদি। গম, কমলা, নাশপাতি কম লবণাক্ততা সহিষ্ণু। লবণাক্ত এলাকায় আমন মৌসুমে চাষের জন্য অনুমোদিত জাত হলো– বিআর ২২, বিআর ২৩,

ব্রি ধান ৪০, ব্রি ধান ৪১, ব্রি ধান ৪৬, ব্রি ধান ৫৩, ব্রি ধান ৫৪ ইত্যাদি। স্থানীয় আমন জাতের মধ্যে রয়েছে রাজাশাইল, কাজলশাইল, বাজাইল ইত্যাদি। বোরো মৌসুমে চাষের জন্য অনুমোদিত জাত ব্রি ধান ৪৭, ব্রি ধান ৫৫।

২. সেচ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা : জমির চারপাশে আইল দিয়ে ভারী সেচ দিলে মাটির দ্রবণীয় লবণ চুঁইয়ে ফসলের মূলাঞ্চলের নিচে চলে যায়। আবার মূলাঞ্চলের নিচ বরাবর গভীরতায় যদি নিষ্কাশন নালা তৈরি করে জমির পানি বের করে দেওয়া যায় তাহলে মূলাঞ্চলের নিচের লবণও ধুয়ে জমির বাইরে চলে যায়। এ অবস্থার মাটিতে জো আসার সাথে সাথে জমি চাষ দিয়ে ফসল বুনতে হবে। হালকা বুনটের মাটিতে এ পদ্ধতি বেশি কার্যকর।

৩. পানির বাষ্পীভবন হ্রাসকরণ : লবণাক্ত জমির মাটিতে লবণ ফসলের মূলাঞ্চলের নিচে রাখতে পারলে ফসল ভালোভাবে চাষ করা যায়। সূর্যালোকের কারণে ভেজা অবস্থায় মাটির উপরিভাগের ছিদ্রের মাধ্যমে পানির বাষ্পীভবন হয়। ফলে বাষ্পীভবনের সাথে লবণ মাটির উপরের দিকে চলে আসে। তাই লবণাক্ত মাটির উপরের স্তরের ছিদ্র বন্ধ করে দিতে হয়। মাটির উপরিভাগে কোদাল, নিড়ানির সাহায্যে মাটি আলগা করে দিলে ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং লবণ মাটির নিচের স্তরেই থেকে যায়। লবণাক্ত এলাকায় মাঠের আমন ধান কেটে নেওয়ার পর জমি ভেজা থাকতেই চাষ দিয়ে রবি ফসল আবাদ করা যায়। তবে বীজ গজানোর বা চারা রোপণের পর ঘন ঘন নিড়ানি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। লবণাক্ত জমিতে প্রতি সেচ বা বৃষ্টিপাতের পর পরই নিড়ানি দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে উপরের স্তরে লবণ জমতে পারে না।

৪. সঠিকভাবে জমি তৈরি : আমন ধান কাটার পর যদি রবি ফসল চাষ করতে দেরি হয় তবে সে সময়ে লবণ মাটির উপর উঠে আসে। তাই তাড়াতাড়ি জমি চাষ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেশি লাঙলের চেয়ে পাওয়ার টিলার ব্যবহার করা উত্তম। শেষ চাষের সময় জমি ভালোভাবে সমান করতে হবে। সমান জমিতে বীজ ভালো গজায়। জমি উঁচু নিচু থাকলে নিচু স্থানে লবণ জমতে পারে।

৫. বপন পদ্ধতির পরিবর্তন : লবণাক্ত জমিতে বীজ ছিটিয়ে বুনলে লবণ তাড়াতাড়ি উপরে আসে এবং বীজ কম গজায়। তাই গর্ত তৈরি করে বীজ মাটির একটু গভীরে বপন করা উচিত। অথবা জমিতে এক মিটার পর পর অগভীর নালা তৈরি করে কয়েক দিন সেচ দিতে হবে। ফলে আইলের মাটির লবণ ধুয়ে নালায় চলে আসবে। এবার আইলের মাটি কোদাল দিয়ে হালকা চাষ দিয়ে বীজ বুনলে ভালো গজাবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে লবণাক্ত সহনশীল ফসল ও অন্যান্য ফসলের জাতের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল

পাঠ ৪ : বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে ফসল উৎপাদন কৌশল

বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছর বন্যা হয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো বছর ভয়াবহ বন্যার কারণে ব্যাপক ফসলহানি হয়ে থাকে। ১৯৯৮ সালে এদেশে দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ বন্যায় তিন লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হ্রাস পায়। এছাড়াও ২০০৪ সালে বন্যায় ১.৩ মিলিয়ন হেক্টর, ২০০৭ সালে বন্যায় ৮.৯ মিলিয়ন হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয় এবং সর্বশেষ ২০২০ সালে দ্বিতীয় দীর্ঘস্থায়ী বন্যা হয়। বন্যার সময় পানির উচ্চতার উপর ভিত্তি করে বন্যাপ্রবণ জমিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন−

১. **মধ্যম উঁচু জমি :** বন্যার সময় পানির উচ্চতা সর্বোচ্চ ০.৯০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

২. **মধ্যম নিচু জমি :** বন্যার সময় পানির উচ্চতা সর্বোচ্চ ১.৮০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৩. **নিচু জমি :** বন্যার সময় পানির উচ্চতা সর্বোচ্চ ৩.০০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৪. **অতি নিচু জমি :** বন্যার সময় পানির উচ্চতা ৩.০০ মিটারের বেশি হয়ে থাকে।

এসব বন্যাপ্রবণ জমিতে মৌসুম ও এলাকাভেদে বোনা আমন, গভীর পানির আমন, রোপা আমন, বোনা আউশ, রোপা আউশ, বোরো ধান চাষ করা হয়ে থাকে।

বন্যাপ্রবণ এলাকায় ফসল উৎপাদনের জন্য প্রধানত দুই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে, যেমন−

১. বন্যা নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা : বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য নদী বা খালের দুই তীর দিয়ে বাঁধ দেওয়া হয়। নদী বা খালে স্লুইস গেট নির্মাণ করে পানিনিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে পানি ফসলের ক্ষেতে প্রবেশ করতে না পারে। তবে এ সব নির্মাণের আগে পরিবেশগত দিক ভালোভাবে বিবেচনা করতে হয়।

২. কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থা : দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যাপ্রবণ এলাকায় বোরো ধান উঠার সময় হঠাৎ করে বন্যা দেখা দেয়। এসব অঞ্চলে আগাম জাতের বোরো ধান চাষ করে ফসল রক্ষা করা যায়। ব্রি ধান ২৮, ব্রি ধান ৩৬ আগে পাকে বলে এ অঞ্চলে চাষ করা উচিত। জানুয়ারি মাসে জমি থেকে পানি বের করে দিয়ে ৬০ দিন বয়সের চারা রোপণ করে ভালো ফলন পাওয়া যায়। এসব জাতের ধান ১৪০-১৫০ দিনের মধ্যে পাকে। ফলে এপ্রিলের শেষে সংগ্রহ করে বন্যা এড়ানো যায়। এ অঞ্চলে রোপা আমন হিসাবে ব্রি ধান ৫১ ও ব্রি ধান ৫২ দুটি অনুমোদিত বন্যা সহনশীল জাত। এ জাত দুটির ১০-১৫ দিন পানির নিচে ডুবে থাকার ক্ষমতা আছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওড় এলাকায় চাষিরা স্থানীয় জাতের গভীর পানির আমন ধানও চাষ করে থাকে।

দেশের মধ্যাঞ্চলে আমন ধান রোপণের আগে বা পরে বন্যা দেখা যায়। অনেক সময় আগাম বন্যার কারণে কৃষকেরা ধানের বীজতলা তৈরি করার জমি পায় না। সে ক্ষেত্রে বাড়ির উঠানে, কোনো উঁচু স্থানে বা ভাসমান বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বীজতলার উপর কলাপাতা বা পলিথিন শিট বিছিয়ে দিয়ে হালকা কাদার প্রলেপ দিয়ে ৫-৬ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখা বীজ ঘন করে বুনে দিতে হয়। এ পদ্ধতিতে এক বর্গমিটার বীজতলায় ২.৫-৩.০ কেজি বীজ বপন করা হয়। একে দাপোগ বীজতলা বলে। দুই সপ্তাহের মধ্যে মূল জমিতে বন্যার পানি নেমে গেলে চারা রোপণ করতে হয়। বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হলে নাবি জাতের আমন ধান, যেমন– নাইজারশাইল, বিআর ২২, বিআর ২৩ চাষ করা উচিত। দাপোগ পদ্ধতিতে দ্রুত চারা উৎপাদনের আরও একটি উপায় আছে। বীজ ২৪ ঘন্টা পানিতে ভেজানোর পর একটু ফাটলে বস্তা বা মাটির কলসে ২৪-৭২ ঘন্টা রেখে দিলে চারা গজিয়ে যায়। এভাবে উৎপাদিত চারা বন্যার পানি নামার সাথে সাথে ছিটিয়ে বপন করা হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে বন্যাপ্রবণ এলাকায় চাষ করা যায় এমন জাতের ধানের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : বন্যাসহিষ্ণু ধান, গভীর পানির আমন ধান, দাপোগ বীজতলা

পাঠ ৫ : প্রতিকূল পরিবেশে পশুপাখি উৎপাদন

প্রাণি তার পারিপার্শ্বিক গাছপালা, পুকুর, নদ-নদী, আবহাওয়া ও জলবায়ু ইত্যাদি নিয়ে গঠিত একটি পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে। পরিবেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর আচরণ যখন পশুপাখি পালনের উপযোগী থাকে না তখন তাকে প্রতিকূল পরিবেশ বলে। লবণাক্ততা, বন্যা ও খরা পশুপাখি উৎপাদনের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পশুপাখির উপর প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাব নিম্নে দেওয়া হলো-

চিত্র : বন্যার সময় ঘরছাড়া পশু

- প্রতিকূল পরিবেশে পশুপাখির খাদ্যাভাব দেখা যায়।
- বিশেষ করে বন্যা ও খরার সময় ঘাসের অভাব হয়।
- লবণাক্ত জমিতে ফসল ও ঘাস জন্মায় না।
- পশুর বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদন অনেক কমে যায়।
- পশু পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত হয়।
- অনেক পশুপাখি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।
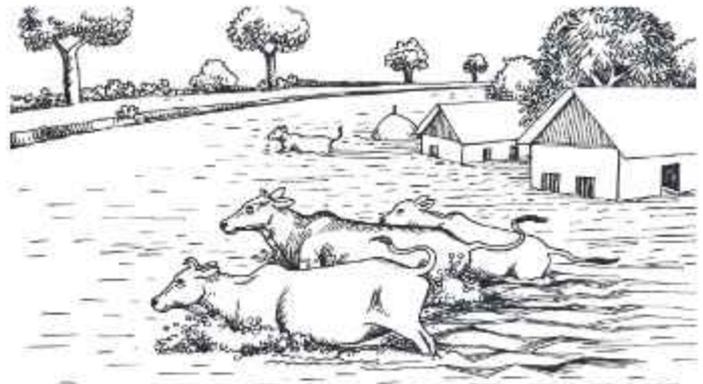
বন্যার সময় করণীয় : এ সময় পশুপাখিকে কোনো উঁচুস্থানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব এলাকায় প্রতিবছর বন্যা দেখা দেয়, সেখানে কোনো উঁচুস্থানে স্থায়ীভাবে পশুপাখির ঘর তৈরি করতে হবে। বন্যাপীড়িত এলাকায় লেয়ার মুরগির খামার না করে ব্রয়লার বা হাঁসের খামার করতে হবে। কারণ মাত্র এক মাস পালন করে ব্রয়লার বাজারজাত করা যায়। বন্যার সময় পশুকে কচুরিপানা, বিভিন্ন গাছের পাতা, ধানের খড়, কলাগাছ ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে সরবরাহ করতে হবে। দেশি মুরগির জন্য আগেই কিছু গম বা ভুট্টা কিনে রাখতে হবে। কারণ মুরগি পানিতে নামে না। এ সময় ছাগল ও ভেড়াকে কলার ভেলা ও নৌকায় রেখেও কিছুদিনের জন্য পালন করা সম্ভব। বন্যার সময় পশুর রোগ ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। পশুর ঘরে যেন কাদামাটি না জমে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বন্যার আগেই পশুকে সম্ভাব্য রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য টিকা প্রদান করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা এককভাবে বন্যার সময় পশুপাখি পালন ও রক্ষার উপায় খাতায় লিখবে ও শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।
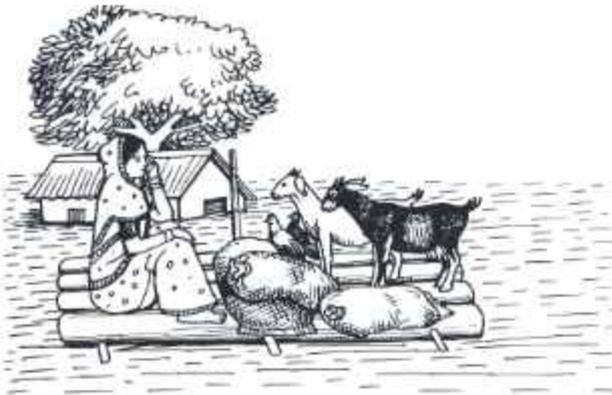
চিত্র : বন্যার সময় কলার ভেলায় ছাগল
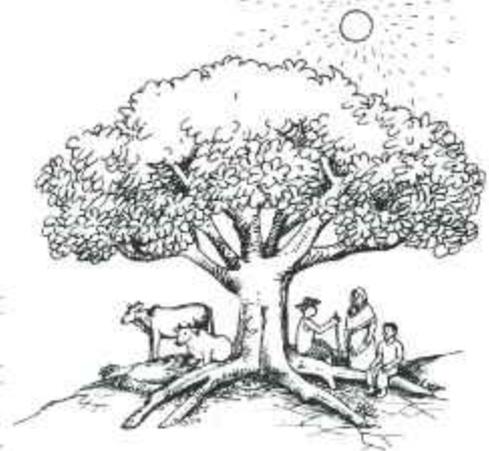
চিত্র : খরার সমর গাছের ছায়ায় মানুষ ও পশু

খরার সময় করণীয় : এ সময় প্রকৃতিতে ঘাস উৎপাদন কমে যায়। এ ক্ষেত্রে পশুকে সুবিধামতো বিভিন্ন গাছের পাতা খাওয়াতে হবে। পশুকে অতি গরমের কারণে খোলাস্থানে বেঁধে রাখা ঠিক নয়। তাই গরমের সময় পশুকে গাছের নিচে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। এ সময় পশুকে প্রচুর খাবার পানি সরবরাহ করতে হবে। অন্যান্য খাদ্যের সাথে দানাজাতীয় খৈল, ভুসি, ভাত গোলানো মাড় খেতে দিতে হবে। পশুকে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক টিকা প্রদান করতে হবে।

লবণাক্ততা, বন্যা ও খরাপীড়িত এলাকায় পশুর জন্য নেপিয়ার, পারা, জার্মান জাতের ঘাস চাষ করা যায়। তা ছাড়া খরার সময় সংরক্ষিত সবুজ ঘাস, আখের উপজাত, কলাগাছ, ইপিল ইপিল গাছের পাতা ইত্যাদি গোখাদ্য হিসেবে বেশ উপযোগী।

বর্তমানে বিশেষ পদ্ধতিতে উৎপাদিত সবুজ শৈবালও পশুকে খাওয়ানো হচ্ছে। তাই খরার সময় এ নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

নতুন শব্দ : প্রতিকূল পরিবেশ, দানাশস্যের উপজাত।

পাঠ ৬ : প্রতিকূল পরিবেশে মৎস্য উৎপাদন ও বিরূপ আবহাওয়ায় মৎস্য রক্ষার কৌশল

যেসব অঞ্চলে সারা বছরই পুকুরে কিছু না কিছু পানি থাকে, বন্যার প্রবণতা কম বা একেবারে নেই; সেই সব এলাকা মাছ চাষের জন্য অধিক উপযোগী। কিন্তু অনেক অঞ্চল রয়েছে সেখানকার পরিবেশ মাছ চাষের জন্য খুব অনুকূল নয়, যেমন– বন্যাপ্রবণ এলাকায় মাছ চাষ করলে বন্যার সময় চাষের পুকুর ডুবে গিয়ে মাছ ভেসে যাওয়ার ভয় থাকে। এতে চাষি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে যেসব এলাকায় খরা বেশি সেখানে খরার সময়ে পুকুরের পানি শুকিয়ে যায় ও মাটির নিচের পানির স্তর অনেক নেমে যায় বলে মাছ চাষ দুরূহ হয়ে পড়ে। আবার জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে নদীগুলোর উজানে পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ায় সাগর স্ফীতির জন্য লোনা পানি নদীর অনেক ভেতর পর্যন্ত ঢুকে পড়ছে। ফলে এ সমস্ত এলাকার পুকুরের পানিরও লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে। এতে এসব এলাকায় স্বাদুপানির মাছ আর আগের মতো ফলন দিচ্ছে না। মৃগেল মাছ লোনাপানি সহ্য করতে পারে না। রুই, কাতলাও আশানুরূপ আকারের হচ্ছে না। প্রতিকূল পরিবেশই শুধু নয় বিরূপ আবহাওয়া যেমন- অতিবৃষ্টি, সাইক্লোন,জলোচ্ছ্বাসও মাছ উৎপাদন ব্যাহত করছে। যেমন- ২০০৭ সালের সিডরে এক লাখ ৩৯ হাজার ৪৭৮টি পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, চাষি হারিয়েছে ছয় হাজার ৫১১ মেট্রিক টন মাছ যার বাজার মূল্য ছিল ৪৭৮ মিলিয়ন টাকা। জাল ও নৌকা হারিয়েছে ৭২১ মিলিয়ন টাকা মূল্যের। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের 'নার্গিস', ২০০৯ সালের 'আইলা', ২০১৩ সালের মহাসেন, ২০১৫ সালের 'বোমেন', ২০১৬ সালের 'রোয়ানু', ২০১৭ সালের 'মেরো' এবং ২০১৯ সালের ফনি বুলবুল- এ ফসল, মৎস্য ও গবাদি পশুর ব্যাপক ক্ষতি হয়। প্রতিকূল পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়ায় মাছ উৎপাদন ও রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে-

১. খরাপ্রবণ এলাকায় বড়ো পোনা ছাড়া যেতে পারে যেন অল্প সময়ে ফলন পাওয়া যায়। আবার যেসব মাছ স্বল্প সময়ে ফলন দেয় যেমন— তেলাপিয়া, খরাপ্রবণ এলাকায় চাষ করা যেতে পারে। চার-পাঁচ মাসেই এর ফলন পাওয়া যায়। এসব অঞ্চলে দেশি মাগুরেরও চাষ করা যেতে পারে।

২. বন্যাপ্রবণ এলাকায় একই পুকুরে একটি দীর্ঘ ও একটি স্বল্পমেয়াদি মাছ চাষ পদ্ধতি নেওয়া যায়। এ সমস্ত এলাকার পুকুরের পাড় উঁচু করে বাঁধতে হবে এবং যে সময় বন্যা থাকে না ঐ সময়ে পোনা মজুদ করা যায়।

৩. উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় লবণাক্ততা সহনশীল চাষযোগ্য মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষের ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন- ভেটকি, বাটা, পারশে। এসব জলাশয়ে চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষের উদ্যোগ নেওয়া যায়। তেলাপিয়াও এক্ষেত্রে ভালো ফলন দেবে।

৪. প্রতিকূল পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ ভেঙে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। এসব এলাকায় পরিকল্পিত মাছ চাষ, খাঁচায় মাছ চাষ ও কাঁকড়া চাষের মাধ্যমে ওই পানিকে কাজে লাগানো যায়।

৫. অতিবৃষ্টির কারণে পুকুর ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে পুকুরের পাড় বরাবর চারপাশে বাঁশের খুঁটির সাহায্যে জাল দিয়ে আটকে দেওয়া যায়। এতে মাছ বাইরে বের হয়ে যেতে পারে না।

৬. গ্রীষ্মের সময় পুকুরের পানির উচ্চতা কমে গেলে ও পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সেচ বা পাম্পের মাধ্যমে পুকুরে পানি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে মাছ পর্যাপ্ত পানি পাবে ও পরিবেশও ঠান্ডা থাকবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা খরা ও বন্যাপীড়িত এলাকায় কী উপায়ে মাছ চাষ করা যায় দলগতভাবে তা আলোচনা করবে ও শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ভেটকি, বাটা, পারশে।

পাঠ ৭ : বিরূপ আবহাওয়ায় ফসল রক্ষার কৌশল

এ অধ্যায়ের প্রথম পাঠে আমরা প্রতিকূল পরিবেশ সম্পর্কে জেনেছি। প্রতিকূল পরিবেশে জলবায়ু ও পরিবেশগত অন্যান্য উপাদান ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের অনুকূলে থাকে না। এ অবস্থা সম্পর্কে মানুষের আগাম ধারণা থাকে। ফলে মানুষ ফসল নির্বাচন থেকে শুরু করে ফসলের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আগে থেকেই সজাগ থাকে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু ফসল উৎপাদন কালে যদি আবহাওয়ার অস্বাভাবিক আচরণের কারণে ফসলের ক্ষতি হয় তখন তাকে আমরা বিরূপ আবহাওয়া বলি।

বিরূপ আবহাওয়া একটি স্বল্পস্থায়ী অবস্থা। কিন্তু এ স্বল্পস্থায়ী অবস্থায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এমনকি ফসল পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অকাল জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, উচ্চ তাপমাত্রা, নিম্ন তাপমাত্রা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, তুষারপাত ইত্যাদি বিরূপ আবহাওয়ার উদাহরণ। এখন আমাদের দেশের কিছু বিরূপ আবহাওয়া এবং সে আবহাওয়ায় ফসল রক্ষার কৌশল নিচে আলোচনা করা হলো–

১. জলাবদ্ধতা : অতিবৃষ্টি বা বন্যার কারণে কোনো স্থান জলাবদ্ধ হয়ে পড়াকে জলাবদ্ধতা বলে। পাহাড়ি ঢলের কারণে জলাবদ্ধতায় হাওড় অঞ্চলে বোরো ধান পাকার সময় তলিয়ে যেতে পারে। বাঁধ ভেঙে জমির ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে বাঁধ মেরামতের দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। সুযোগ থাকলে নিষ্কাশন নালা কেটে জলাবদ্ধ জমি থেকে পানি বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আগাম বন্যায় কোনো এলাকার আমন রোপণ ব্যাহত হলে বন্যামুক্ত এলাকায় চারা উৎপাদন করে ঐ এলাকার পানি নেমে গেলে রোপণের ব্যবস্থা করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কৃষকরা যাতে দ্রুত অন্য ফসল চাষাবাদে যেতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় বীজ, চারা ও সার সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে।

২. অতিবৃষ্টি : বাংলাদেশে জুন থেকে অক্টোবর মাসে বেশি বৃষ্টি হয়ে থাকে। এ সময়ে কখনো কখনো একটানা কয়েকদিন অতি বৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ফলে মাঠঘাট, ফসলের জমিতে পানি জমে যায়। অনেক ফসলের গাছ গোড়া নড়ে নেতিয়ে বা হেলে পড়ে। এ ধরনের আবহাওয়ায় ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারার গোড়ায় মাটি দিয়ে সোজা করে বাঁশের খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। এ সময় শাকসবজির মাঠ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শাকসবজির মাঠ থেকে দ্রুত পানি বের করে দিতে হবে। এ জন্য নিষ্কাশন নালা কোদাল দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। এ মৌসুমে শাকসবজি চাষ করলে সাধারণত উঁচু বেড করে চাষ করা হয়। দুটি বেডের মাঝে ৩০ সে.মি. নালা রাখা হয়।

৩. অনাবৃষ্টি : যদি শুষ্ক মৌসুমে একটানা ১৫ দিন বা এর বেশি বৃষ্টি না হয় তখন আমরা তাকে অনাবৃষ্টি বলি। অনাবৃষ্টির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য আমরা সেচ দিয়ে থাকি। বৃষ্টিনির্ভর আমন ধান চাষের ক্ষেত্রে যদি অনাবৃষ্টি দেখা দেয় তবে জমিতে সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। জমিতে নিড়ানি দিয়ে মাটির ফাটল বন্ধ করে রাখতে হবে। তাহলে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পানি কম বের হবে। রবি মৌসুমে সবজি ক্ষেতে জাবড়া প্রয়োগ করে পানি সংরক্ষণ করতে হবে। অনাবৃষ্টির কারণে মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে পাট, ধান ও শাকসবজির জমিতে বীজ বপনের জো পাওয়া না গেলে বীজ বুনে সেচ দিতে হবে অথবা সেচ দিয়ে জো এলে বীজ বুনতে হবে।

৪. শিলাবৃষ্টি : বাংলাদেশে সাধারণত মার্চ-এপ্রিল মাসে শিলাবৃষ্টি হয়। অনেক সময় আগাম শিলাবৃষ্টির কারণে বিশেষ করে রবি ফসল, যেমন– পেঁয়াজ, রসুন, গম, আলু ইত্যাদি নষ্ট হয়। শিলার আকার ও পরিমাণের উপর ক্ষতি নির্ভর করে। ক্ষতি বেশি হলে এসব ফসল ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। আর যদি ক্ষতির পরিমাণ কম হয় এবং ফসল পরিপক্ব হতে বিলম্ব থাকে সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত শাখা-প্রশাখা ছাঁটাই করে অবশিষ্ট ফসলের যত্ন নিতে হবে। অনেক সময় এপ্রিল-মে মাসে শিলাবৃষ্টির কারণে বোরো ধান, আম, ঢেড়শ, বেগুন, মরিচ ইত্যাদি ফসল ক্ষতির শিকার হয়। বেগুন, মরিচ, ঢেঁড়শ ইত্যাদি ফসল বাড়ন্ত অবস্থায় শিলার আঘাতে ডালপালা ভেঙে নষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে ভাঙা ডালপালা ছাঁটাই করে সার ও সেচ দিয়ে যত্ন নিলে ফসলকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসেবে প্রতিকূল পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যে পার্থক্য পোস্টার পেপারে লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : বিরূপ আবহাওয়া

পাঠ ৮ : বিরূপ আবহাওয়ায় পশুপাখি রক্ষার কৌশল

যেকোনো দেশেরই তার আবহাওয়া ও ভূপ্রকৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি একটি নির্দিষ্ট নিয়মে চক্রাকারে চলতে থাকে। কিন্তু নিয়মের বাইরে হঠাৎ করে অকালবন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি, অতিঠান্ডা, ভূমিকম্প ইত্যাদি মানুষ ও পশুপাখির অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। হঠাৎ করে দেখা দেওয়া পরিবেশের এরূপ আচরণকে বিরূপ আবহাওয়া বলা হয়। মনে রাখতে হবে প্রতিকূল পরিবেশ স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি বছর আসে কিন্তু বিরূপ আবহাওয়া হঠাৎ করে চলে আসে। পশুপাখির উপর বিরূপ আবহাওয়ার প্রভাব নিম্নে দেওয়া হলো-

- বিরূপ আবহাওয়ায় পশুর অভিযোজন হতে সময় লাগে।
- পশুপাখির খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।
- পশুপাখি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।
- জীবিত পশুপাখির দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন কমে যায়।
- অনেক পশুপাখির মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে।
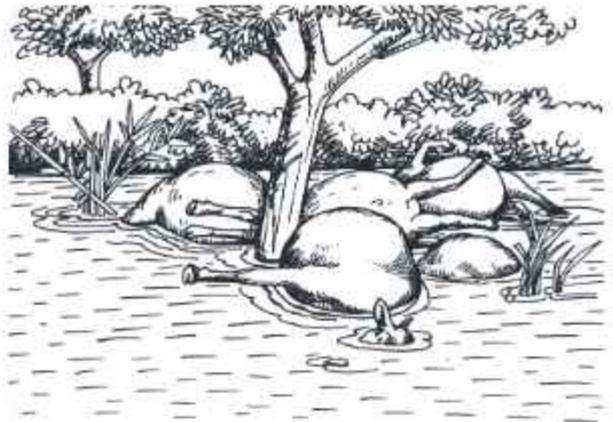
চিত্র : জলোচ্ছ্বাসে মৃত পশু

যেহেতু বিরূপ আবহাওয়া হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়, তাই এ সমস্যাকে মোকাবেলার জন্য কোনো পূর্বপ্রস্তুতি থাকে না, ফলে এর সমাধান কঠিন হয়ে পড়ে। বিরূপ আবহাওয়া হঠাৎ সৃষ্টি হলেও তা কখন হতে পারে এ সম্পর্কে বর্তমানে আবহাওয়াবিদগণ পূর্বাভাস দিয়ে থাকেন। তাই সে মোতাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তুতি থাকা আবশ্যক। বিরূপ আবহাওয়া মোকাবেলা একটি স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলার জন্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়।

বিরূপ আবহাওয়ায় বিশেষ করে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় মানুষ নিজেই অসহায় থাকে। তবুও এ সময় পশুপাখি রক্ষার চেষ্টা করতে হবে। হঠাৎ জলাবদ্ধতা ও বন্যার সৃষ্টি হলে অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে পশুপাখিকে আশ্রয় দিতে হবে। আগেই সংরক্ষণ করা খড়, গাছের পাতা, কচুরিপানা ও দানাদার খাদ্য পশুকে সরবরাহ করতে হবে। অতিবৃষ্টিতে পশুকে ঘরের বাইরে নেওয়া সম্ভব হয় না, তাই এ সময়ও পশুকে উল্লিখিত খাদ্য খেতে দিতে হয়। বিশেষ করে ছাগলের জন্য কাঁঠাল পাতা সংগ্রহ করে তার সামনে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

চিত্র : বিরূপ আবহাওয়ায় ছাগল পাতা খাচ্ছে

চিত্র : পশুর জন্য কচুরিপানা কাটা হচ্ছে

শীতের সময় পশুকে অতিঠান্ডার হাত থেকে রক্ষার জন্য পশুর ঘরের চারপাশে বাতাস চলাচল বন্ধ করতে হবে। ঘরের মেঝেতে খড় বা নাড়া বিছিয়ে দিতে হবে। গরুর বাছুর যাতে নিউমোনিয়া আক্রান্ত না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মৃত পশুপাখিকে মাটির নিচে চাপা দিতে হবে। পশু ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক বেঁচে থাকা অসুস্থ পশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টিকারী জলবায়ুগত উপাদান কোনটি?

ক. জলাবদ্ধতা
খ. মাটির লবণাক্ততা
গ. বাতাসের বিষাক্ত গ্যাস
ঘ. মাটিতে বিষাক্ত রাসায়নিক

২. মাটির উপরিভাগের সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিলে—

ক. রস সংরক্ষণ হবে
খ. আগাছা নিয়ন্ত্রণ হবে
গ. জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে
ঘ. উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে

৩. কচুরিপানা দিয়ে মাটি ঢেকে দিলে—

i. পানি সংরক্ষিত হবে
ii. পুষ্টি উপাদান কমে যাবে
iii. আগাছার উপদ্রব কম হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

আষাঢ় মাসে আগাম বন্যা দেখা দেওয়ায় নাসির উদ্দিন কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে আমন ধানের চারার জন্য ১ বর্গমিটার আয়তনের ৩টি ভাসমান বীজতলা তৈরি করে ধানের বীজ বপন করেন।

৪. নাসির উদ্দিন সাহেবের ৩টি বীজতলায় কত কেজি ধানের বীজ বপন করেছিলেন?

ক. ২.৫- ৩.০ কেজি
খ. ৫.০- ৬.০ কেজি
গ. ৭.৫- ৯.০ কেজি
ঘ. ১০.০- ১২.০ কেজি

৫. নাসির উদ্দিন এভাবে বীজতলা তৈরি করে চারা উৎপাদনের কারণে-

ক. সঠিক সময়ে ফলন পাবেন
খ. ধানের আগাম ফলন পাবেন
গ. ধানের ফলন বেশি পাবেন
ঘ. ধানের গুণগতমান ভালো হবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ২০০৭ সালের সিডরের সময় বেড়িবাঁধ ভেঙে গিয়ে আল-আমিনের জমিগুলো সমুদ্রের পানি দ্বারা প্লাবিত হয়। বেড়িবাঁধ মেরামতের পরেও জমিতে ভালো ফসল উৎপাদন করতে না পেরে কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ চাইলেন। কৃষি কর্মকর্তা আল-আমিনকে তার জমির সমস্যাগুলো বুঝিয়ে দিয়ে কী ধরনের ফসল চাষ করতে হবে এবং কী ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করতে হবে সে পরামর্শ দিলেন। কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুসরণ করায় আল-আমিন তার জমির সমস্যা কাটিয়ে একজন সফল চাষিতে পরিণত হয়েছেন।

ক. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে লবণাক্ততা সমস্যা বেশি?

খ. বৃষ্টি হলে লবণাক্ততা কমে যায় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. আল-আমিন কী ধরনের মাঠে ফসল চাষ করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আল-আমিনের সফলতার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. কয়েক বছর যাবৎ কম বৃষ্টিপাত হওয়ায় লালপুর গ্রামের কৃষকেরা ফসল উৎপাদনে মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন। এ অবস্থায় তারা কৃষিবিদ মিজান সাহেবের পরামর্শের জন্য গেলেন। মিজান সাহেব তাদেরকে বৃষ্টিহীন অবস্থায় ফসল চাষের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে বলেন। সে অনুযায়ী কৃষকরা ফসলের কিছু নতুন জাত ও আবর্জনা সংগ্রহ করেন। পরামর্শ অনুযায়ী ফসল উৎপাদন কৌশল অবলম্বন করে বর্তমানে তারা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

ক. দাপোগ বীজতলা কী?

খ. মাটিতে রসের ঘাটতি হলে কী সমস্যা হয়- ব্যাখ্যা কর।

গ. কৃষকদের আবর্জনা সংগ্রহের কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নতুন ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের ফসল উৎপাদন কৌশল বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষিজ উৎপাদন

এ অধ্যায়ে ফসল উৎপাদনের মধ্যে গম চাষ, মাশরুম চাষ পদ্ধতি এবং কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ ও বাছাই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মাছ চাষের মধ্যে মিশ্র মাছ চাষ পদ্ধতি (রুই, কাতলা, মৃগেল), চিংড়ি চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু পালন পদ্ধতি ও রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

চিত্র : গম
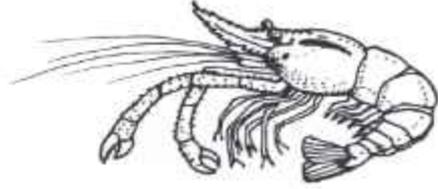
চিত্র : চিংড়ি

চিত্র : মাশরুম
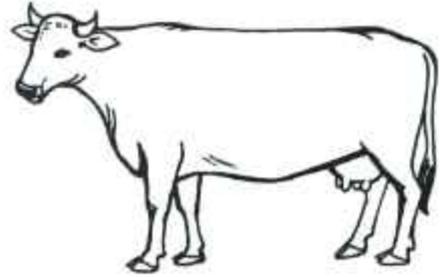
চিত্র : গরু

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- শস্য চাষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মিশ্র মাছ চাষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চিংড়ি চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- গৃহপালিত পশুপালন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- গৃহপালিত পশুর রোগ প্রতিরোধের উপায় ও রোগ ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ ও বাছাইকরণ কাজ বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ ১ : গম চাষপদ্ধতি

দানা ফসল শর্করার প্রধান উৎস। এ কারণে পৃথিবীর সকল দেশে খাদ্যশস্য হিসেবে দানা ফসল চাষ করা হয়। বিশ্বের অনেক দেশে গম প্রধান খাদ্যশস্য। বাংলাদেশে ধানের পরে খাদ্যশস্য হিসেবে গমের অবস্থান দ্বিতীয়। বর্তমানে দেশের প্রায় সব জেলাতেই গমের চাষ করা হয়। তবে দিনাজপুর, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, জামালপুর, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলায় বেশি চাষ হয়। বাংলাদেশে গমের অনেক উচ্চফলনশীল অনুমোদিত জাত রয়েছে। তন্মধ্যে কাঞ্চন, আকবর, অগ্রাণী, প্রতিভা, সৌরভ, গৌরব, শতাব্দী, প্রদীপ, বিজয় ইত্যাদি জাত জনপ্রিয়।

বপন সময় : গম শীতকালীন ফসল। বাংলাদেশে শীতকাল স্বল্পস্থায়ী। এ কারণে গমের ভালো ফলন পেতে হলে সঠিক সময়ে গম বীজ বপন করা উচিত। আমাদের দেশে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত গম বপনের উপযুক্ত সময়। উঁচু ও মাঝারি দোঁআশ মাটিতে গম ভালো জন্মে। তবে লোনা মাটিতে গমের ফলন কম হয়। যেসব এলাকায় ধান কাটতে ও জমি তৈরি করতে দেরি হয় সেসব এলাকায় কাঞ্চন, আকবর, প্রতিভা, গৌরব চাষ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

বীজের হার : বীজ গজানোর হার শতকরা ৮৫ ভাগের বেশি হলে ভালো। এক হেক্টর জমিতে ১২০ কেজি গম বীজ বপন করতে হয়। বপনের আগে বীজ শোধন করে নিলে বীজবাহিত অনেক রোগ প্রতিরোধ করা যায়। প্রতি কেজি বীজ ৩ গ্রাম প্রভেক্স ২০০-এর সাথে ভালো করে মিশিয়ে বীজ শোধন করা যায়।

বপন পদ্ধতি : জমিতে জো (যে অবস্থায় জমিতে কাঙ্খিত পানি উপস্থিত থাকে, তাকে জো বলে) এলে ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে তৈরি করতে হবে। জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে সেচ দেওয়ার পর জো এলে চাষ দিতে হবে। সারিতে বা ছিটিয়ে গম বীজ বপন করা যায়। ছিটিয়ে বপন করলে শেষ চাষের সময় সার ও বীজ ছিটিয়ে মই দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয়। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে জমি তৈরির পর ছোট হাত লাঙল দিয়ে ২০ সে.মি. দূরে দূরে সরু নালা তৈরি করতে হয়। ৪-৫ সে.মি. গভীর নালায় বীজ বপন করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। বপনের ১৫ দিন পর পর্যন্ত পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : সেচসহ চাষের ক্ষেত্রে মোট ইউরিয়া সারের তিন ভাগের দুই ভাগ এবং সবটুকু টিএসপি, এমওপি ও জিপসাম সার শেষ চাষের সময় দিতে হবে। বাকি এক ভাগ ইউরিয়া সার প্রথম সেচের সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সেচ ছাড়া চাষের ক্ষেত্রে পুরো ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি এবং জিপসাম সার শেষ চাষের সময় জমিতে দিতে হবে।

গম চাষে সার প্রয়োগের পরিমাণ নিচের তালিকায় দেওয়া হলো :

সারের নাম		সারের পরিমাণ/হেক্টর
সারের পরিমাণ/হেক্টর		
	সেচসহ	সেচ ছাড়া
ইউরিয়া	২০০ কেজি	১৬০ কেজি
টিএসপি	১৬০ কেজি	১৬০ কেজি
এমওপি	৪৫ কেজি	৩৫ কেজি
জিপসাম	১১৫ কেজি	৮০ কেজি
গোবর/কম্পোস্ট সার	৮.৫ টন	৮.৫ টন

পানি সেচ : মাটির বুনটের প্রকার অনুযায়ী গম চাষে ২-৩টি সেচের প্রয়োজন হয়। প্রথম সেচ চারার তিন পাতার সময়, দ্বিতীয় সেচ গমের শিষ বের হওয়ার সময় এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের সময় দিতে হবে।

আগাছা দমন : সার, সেচের পানি ইত্যাদিতে আগাছা ভাগ বসায়। ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের আগে নিড়ানি দিতে হবে। উপরি প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে। গম ক্ষেত আগাছামুক্ত রাখার জন্য কমপক্ষে দুবার নিড়ানি দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ : গম পাকলে গাছ হলদে হয়ে মরে যায়। তালুতে শিষ নিয়ে ঘষলে দানা বের হয়ে আসবে। এ অবস্থায় গম কেটে ভালোভাবে শুকিয়ে মাড়াই যন্ত্র দিয়ে মাড়াই করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসেবে গমের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ২ : গম চাষে অন্যান্য প্রযুক্তি ও পরিচর্যা

বিনা চাষে গমের আবাদ

অনেক জমিতে রোপা আমন ধান কাটিতে দেরি হয়। ফলে জমি চাষ-মই দিয়ে বীজ বোনার সময় থাকে না। এক্ষেত্রে বিনা চাষে গম আবাদ করা যায়। ধান কাটার পর যদি জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকে অর্থাৎ হাঁটলে পায়ের দাগ পড়ে তবে সরাসরি বীজ বুনতে হয়। আবার জমিতে জো না থাকলে হালকা সেচ দিয়ে জো এলে বীজ বুনতে হয়। প্রথমে গম বীজ গোবর গোলানো পানিতে কয়েক ঘন্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে। পরে পানি থেকে উঠিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। এতে বীজের গায়ে গোবরের প্রলেপ লেগে যায়। এ বীজ বপন করলে পাখির উপদ্রব কম হয় এবং বীজ রোদে শুকিয়ে যায় না।

এভাবে গম চাষ করলে দুভাবে সার দেওয়া যায়– ১) বীজ বোনার সময় সব সার ছিটানো, ২) বীজ বপনের ১৭-২০ দিনের মধ্যে প্রথম হালকা সেচ দেওয়ার সময় সব সার ছিটানো। বীজ বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে আগাছা দমন করা প্রয়োজন হয়।

স্বল্প চাষে গমের আবাদ

দেশি লাঙল দিয়ে দুটি চাষ দিয়ে গম বীজ বপন করা যায়। ধান কাটার পর জমিতে জো আসার সাথে সাথে চাষ করতে হবে। আবার জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে সেচ দেয়ার পর জো আসলে চাষ দিতে হবে। প্রথমে একটি চাষ ও মই দিতে হবে। দ্বিতীয় চাষ দেওয়ার পর সব সার ও বীজ ছিটিয়ে দিয়ে মই দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। বপনের ১৭-২১ দিনের মধ্যে হালকাভাবে প্রথম সেচ দিতে হবে। প্রথম সেচের সময় ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে আগাছা দমন করলে ভালো ফলন পাওয়া যাবে।

গম চাষে রোগ দমন

গম চাষে পোকা মাকড়ের আক্রমণ তেমন একটা হয় না। তবে ছত্রাকজনিত বেশ কিছু রোগ দেখা দিতে পারে। এছাড়া অনেক সময় ইঁদুরের উপদ্রব দেখা যায়। ছত্রাকজনিত রোগের মধ্যে ১) পাতার মরিচা রোগ, ২) পাতার দাগ রোগ, ৩) গোড়া পচা রোগ, ৪) আলগা ঝুল রোগ এবং ৫) বীজের কালো দাগ রোগ অন্যতম।

পাতার মরিচা রোগে প্রথমে পাতার উপর ছোটো গোলাকার হলুদাভ দাগ পড়ে। শেষ পর্যায়ে এ রোগে মরিচার মতো বাদামি বা কালচে রঙে পরিণত হয়। হাত দিয়ে আক্রান্ত পাতা ঘষা দিলে লালচে মরিচার মতো গুড়া হাতে লাগে। এ রোগের লক্ষণ প্রথমে নিচের পাতায়, পরে সব পাতায় ও কাণ্ডে দেখা যায়। পাতার দাগ রোগে প্রথমে নিচের পাতায় ছোটো ডিম্বাকার দাগ পড়ে। পরে দাগ আকারে বেড়ে পাতা ঝলসে যায়। এ রোগের জীবাণু বীজে বা ফসলের পরিত্যক্ত অংশে বেঁচে থাকে। গোড়া পচা রোগে মাটির সমতলে গাছের গোড়ায় হলদে দাগ দেখা যায়। পরে দাগ গাঢ় বাদামি বর্ণ ধারণ করে আক্রান্ত স্থানের চারপাশ ঘিরে ফেলে। একসময় গাছ শুকিয়ে মারা যায়।

চিত্র : পাতার মরিচা রোগ

গমের শিষ বের হওয়ার সময় আলগা ঝুল রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রান্ত গমের শিষ প্রথম দিকে পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। পরে তা ফেটে যায় এবং দেখতে কালো ঝুলের মতো দেখায়। বীজের কালো দাগ রোগের ফলে গমের খোসায় বিভিন্ন আকারের বাদামি অথবা কালো দাগ পড়ে। বীজের ভ্রূণে দাগ পড়ে এবং আস্তে আস্তে দাগ পুরো বীজে ছড়িয়ে পড়ে।

চিত্র : আলগা ঝুল রোগ

গমের এসব ছত্রাকজনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য সমন্বিত ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগ প্রতিরোধী জাতের গম যেমন– কাঞ্চন, আকবর, অঘ্রাণী, প্রতিভা, সৌরভ, গৌরব চাষ করতে হবে। রোগমুক্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। গম বীজ বপনের আগে শোধন করে নিতে হবে। সুষম হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

ইঁদুর গমের একটি প্রধান শত্রু। গমের শিষ আসার পর ইঁদুরের উপদ্রব শুরু হয়। গম পাকার সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। ইঁদুর দমনের জন্য হাতে তৈরি বিষ টোপ বা বাজার থেকে কেনা বিষ টোপ ব্যবহার করা যায়। এসব বিষ টোপ সদ্য মাটি তোলা ইঁদুরের গর্তে বা চলাচলের রাস্তায় পেতে রাখতে হয়। বিষ টোপ ছাড়া বাঁশ বা কাঠের তৈরি ফাঁদের সাহায্যেও ইঁদুর দমন করা যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে বিনা চাষে গমের আবাদ এবং স্বল্প চাষে গমের আবাদ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : বিনা চাষে গমের আবাদ, স্বল্প চাষে গমের আবাদ, পাতার মরিচা রোগ, আলগা ঝুল রোগ

পাঠ ৩ : মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা

আমরা জানি ছত্রাক ফসলের অনেক রোগের জন্য দায়ী। কিন্তু সব ছত্রাক রোগ সৃষ্টি করে না। অনেক ছত্রাক রয়েছে যারা আমাদের জন্য উপকারী। মাশরুম এমন এক ধরনের ছত্রাক যা সম্পূর্ণ খাওয়ার উপযোগী, পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও ঔষধি গুণ সম্পন্ন। আসলে মাশরুম এক ধরনের মৃতজীবী ছত্রাকের ফলন্ত অঙ্গ যা ভক্ষণযোগ্য।

চিত্র : মাশরুম (ওয়েস্টার)

মাশরুম ও ব্যাঙের ছাতা এক জিনিস নয়। ব্যাঙের ছাতা প্রাকৃতিকভাবে যত্রতত্র গজিয়ে উঠা বিষাক্ত ছত্রাকের ফলন্ত অঙ্গ। আর মাশরুম টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উৎপন্ন বীজ দ্বারা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে চাষ করা সবজি।

মাশরুম নিজে সুস্বাদু খাবার এবং অন্য খাবারের সাথে ব্যবহার করলে তার স্বাদও বাড়িয়ে দেয়। মাশরুমের স্বাদ মাংসের মতো। মাশরুম দিয়ে চায়নিজ ও পাঁচতারা হোটেলে নানা রকম মুখরোচক খাবার তৈরি করা হয়। তবে দেশীয় পদ্ধতিতে মাশরুম সবজি, ফ্রাই, স্যুপ, পোলাও, বিরিয়ানি, নুডুলস, চিংড়ি ও ছোটো মাছের সাথে ব্যবহার করা যায়। মাশরুম তাজা, শুকনা বা গুঁড়া হিসেবে খাওয়া যায়।

পুষ্টিমান বিচারে মাশরুম সবার সেরা ফসল। কারণ মাশরুমে অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান, যেমন– প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজপদার্থ অতিউচ্চ মাত্রায় আছে। প্রতি ১০০ গ্রাম শুকনা মাশরুমে ২৫-৩৫ গ্রাম আমিষ, ১০-১৫ গ্রাম সব ধরনের ভিটামিন ও খনিজপদার্থ, ৪০-৫০ গ্রাম শর্করা ও আঁশ এবং ৪-৬ গ্রাম চর্বি আছে। মাশরুমের আমিষ অত্যন্ত উন্নত মানের। এ আমিষে মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় ৯টি অ্যামাইনো অ্যাসিডই আছে। এ আমিষ গ্রহণে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও মেদভুঁড়ি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কারণ আমিষের সাথে ক্ষতিকর চর্বি থাকে না। পক্ষান্তরে মাশরুমের চর্বি হাড় ও দাঁত তৈরিতে এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়তা করে। মাশরুমের শর্করায় অনেক ধরনের রাসায়নিক উপাদান থাকে যা অনেক জটিল রোগ নিরাময়ে কাজ করে।

ভিটামিন ও মিনারেল দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে। আমাদের দেহের জন্য দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ভিটামিন ও খনিজপদার্থের চাহিদা রয়েছে। আমরা প্রতিদিন মাশরুম খাওয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজপদার্থের চাহিদা মেটাতে পারি। মাশরুমে থায়ামিন (বি ১), রিবোফ্লাবিন (বি ২), নায়াসিন ইত্যাদি ভিটামিন এবং ফসফরাস, লৌহ, ক্যালসিয়াম, কপার ইত্যাদি খনিজপদার্থ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। পুষ্টিগুণের কারণে মাশরুম অনেক রোগের প্রতিরোধক ও নিরাময়কারী হিসেবে কাজ করে, যেমন– ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তশূন্যতা, আমাশয়, চুল পড়া, ক্যান্সার, টিউমার ইত্যাদি।

একজন সুস্থ লোকের প্রতিদিন ২০০-২৫০ গ্রাম সবজি খাওয়া প্রয়োজন। আমরা প্রতিদিন গড়ে ৪০-৫০ গ্রাম (আলু ব্যতীত) সবজি খাই। যা চাহিদার তুলনায় খুবই কম। ফলে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেলের অভাবে বিভিন্ন রোগে ভুগে থাকি। বাংলাদেশে দ্রুত চাষযোগ্য জমি কমে যাচ্ছে। অধিকাংশ জমি ধান চাষে ব্যবহৃত হয়। সবজি চাষের আওতায় জমির পরিমাণ বাড়ানো কঠিন। এমতাবস্থায় মাশরুম হতে পারে আদর্শ ফসল। মাশরুম এমন একটি ফসল যা চাষ করার জন্য কোনো উর্বর জমির প্রয়োজন নেই। ঘরের মধ্যে তাকের উপর রেখেও চাষ করা যায়

এবং অত্যন্ত অল্প সময়ে অর্থাৎ ৭-১০ দিনের মধ্যে ফলানো যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু মাশরুম চাষের অত্যন্ত উপযোগী। মাশরুম চাষের উপকরণ, যেমন–খড়, কাঠের গুড়া, আখের ছোবড়া, পচা পাতা ইত্যাদি সস্তা ও সহজলভ্য।

মাশরুম চাষ ব্যবসায়িক দিক থেকে খুবই লাভজনক। কারণ মাশরুম চাষে কম পুঁজি, কম শ্রম দরকার হয়। অল্পদিনের মধ্যে বিনিয়োগকৃত অর্থ তুলে আনা যায়। অন্যদিকে একক জায়গায় অধিক ফলন, লাভজনক বাজারমূল্য পাওয়া যায়। তাই মাশরুম চাষ করে বেকার যুবসমাজ সহজেই আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। ঘরে ঘরে মাশরুম চাষ করে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা যেমন মেটানো যাবে তেমনি বাজারে বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যাবে।

কাজ : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা ও একজন মাশরুম চাষির সফলতার কাহিনি পোস্টার বা ভিডিও এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন। সে অনুসারে শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসেবে মাশরুমের পুষ্টিমান সম্পর্কে এবং দলীয় কাজ হিসেবে মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪ : মাশরুম চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে চাষ করা যায় মিল্কি, ঋষি ও স্ট্র মাশরুম এবং শীতকালে শীতাকে, বাটন, শিমাজি ও ইনোকি মাশরুম। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চাষ করা হয় বারোমাসি ওয়েস্টার মাশরুম। বিভিন্ন ধরনের মাশরুম চাষে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। আমরা এ পাঠে ওয়েস্টার মাশরুম চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।
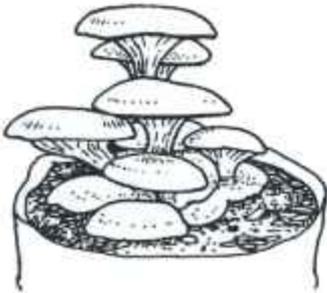
চিত্র : ওয়েস্টার মাশরুম
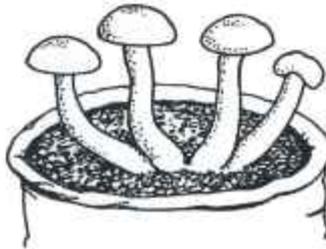
চিত্র : মিল্কি হোয়াইট মাশরুম
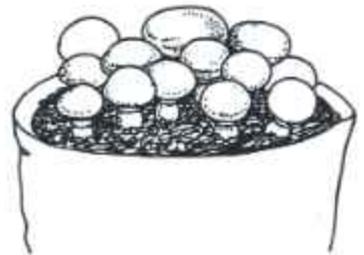
চিত্র : বাটন মাশরুম

মাশরুমের বীজ বা স্পন তৈরি : মাশরুমের বীজ ল্যাবরেটরিতে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়। চাষি পর্যায়ে মাশরুম চাষের জন্য প্যাকেটজাত বীজ কিনতে পাওয়া যায় যাকে বাণিজ্যিক স্পন বলে। আবার খড় দিয়ে চাষিরা নিজেরাও স্পন তৈরি করে নিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে চাষিদেরকে বাজার থেকে মাদার স্পন সংগ্রহ করে স্পন তৈরি করে নিতে হয়।

চিত্র : বাণিজ্যিক স্পন

চাষঘর তৈরি : মাশরুম চাষের ঘরটিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন প্রবেশের জন্য জানালা রাখতে হবে। ঘরটিতে আবছা আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। ঘরের তাপমাত্রা ২০-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। মাশরুম আর্দ্র অবস্থা পছন্দ করে। ঘরটিতে ৭০-৮০% আপেক্ষিক আর্দ্রতার ব্যবস্থা করতে হবে। মাশরুম চাষঘরে অসংখ্য অনুজীবের শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে প্রচুর কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়। কার্বন ডাই অক্সাইড ভারী বলে নিচের দিকে জমা হয়। এজন্য বেড়ার নিচে খোলা রাখতে হয়।

স্পন সংগ্রহ : চাষঘর তৈরির পর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে পলি প্যাকেটে তৈরি স্পন সংগ্রহ করতে হবে। ভালো স্পনের বৈশিষ্ট্য হলো প্যাকেটটি সুষমভাবে মাইসিলিয়াম দ্বারা পূর্ণ ও সাদা হবে। স্পন সংগ্রহের পর তাড়াতাড়ি প্যাকেট কাটার ব্যবস্থা করতে হবে। কাটতে দেরি হলে বস্তা থেকে প্যাকেট বের করে আলাদা আলাদা জায়গায় ঘরের ঠান্ডা স্থানে রাখতে হবে।

প্যাকেট কর্তন : চাষঘরে বসানোর আগে স্পন প্যাকেট সঠিক নিয়মে কেটে চেঁছে পানিতে চুবিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। স্পন প্যাকেটের কোনাযুক্ত দুই কাঁধ বরাবর প্রতি কাঁধে ৫ সে মি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি ব্যাস করে কাটতে হবে। উভয় পার্শ্বের এ কাটা জায়গার সাদা অংশ ব্লেড দিয়ে চেঁছে ফেলতে হবে। এবার প্যাকেটটি ৫-১৫ মিনিট পানিতে উপুড় করে চুবিয়ে নিতে হবে। চুবানোর পর পানি ভালোভাবে ঝরিয়ে সরাসরি চাষঘরের মেঝেতে অথবা তাকে সারি করে সাজিয়ে চাষ করতে হবে।

পরিচর্যা : চাষঘরের মেঝে বা তাকে দুই ইঞ্চি পর পর স্পন সাজাতে হবে। স্পন প্যাকেটের চারপাশের আর্দ্রতা ৭০-৮০% রাখার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী গরমে ৪-৫ বার, শীতে বা বর্ষায় ২-৩ বার পানি স্প্রে করতে হবে। স্প্রেয়ারের নজল প্যাকেটের এক ফুট উপরে রেখে স্প্রে করতে হবে। আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্পন প্যাকেটের উপর কখনো খবরের কাগজ ভিজিয়ে, কখনো বস্তা ভিজিয়ে একটু উঁচু করে রাখতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা : পরিচর্যা ঠিকমতো হলে ২-৩ দিনের মধ্যে মাশরুমের অঙ্কুর পিনের মতো বের হবে। প্রতি পার্শ্বে ৮-১২টি বড়ো অঙ্কুর রেখে ছোটগুলো কেটে ফেলতে হবে। ৫-৭ দিনের মধ্যে মাশরুম তোলার উপযোগী হবে। প্রথমবার মাশরুম তোলার পর একদিন বিশ্রাম অবস্থায় রাখতে হবে। পরের দিন আগের কাটা অংশে পুনরায় ব্লেড দিয়ে চেঁছে ফেলে পানি স্প্রে করতে হবে। একটি প্যাকেট থেকে ৮-১০ বার মাশরুম সংগ্রহ করা যায়। এতে একটি প্যাকেট থেকে ২০০-২৫০ গ্রাম মাশরুম পাওয়া যাবে।

মাশরুম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : মাশরুম যথেষ্ট বড়ো হয়েছে কিন্তু শিরাগুলো ঢিলা হয়নি— এমন অবস্থায় হাত দিয়ে আলতো করে টেনে তুলতে হবে। পরে গোড়া কেটে বাছাই করে পলি ব্যাগে ভরে মুখ বন্ধ করে বাজারজাত করতে হবে। এগুলো ঠান্ডা জায়গায় ২-৩ দিন রেখে খাওয়া যায়। ফ্রিজে রাখলে ৭-৮ দিন ভালো থাকে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে ওয়েস্টার মাশরুম চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : মৃতজীবী ছত্রাক, ফলন্ত অঙ্গ, চাষঘর, স্পন।

পাঠ ৫ : উদ্যান ফসল সংগ্রহ ও বাছাই

ফল, শাক-সবজি ও ফুল দ্রুত পচনশীল। এসব পণ্য দেশীয় প্রচলিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ, বাছাই ও বাজারজাত করায় ক্ষেত্র বিশেষে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। আর্থিক ও পুষ্টির বিবেচনায় এ ক্ষতি অপরিসীম। কিন্তু তোলা থেকে শুরু করে বাজারজাত করা পর্যন্ত একটু সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পণ্যের বাহ্যিক তরতাজা চেহারা, নিজ নিজ স্বাদ, গন্ধ, রং ও গুণগতমান পুরোপুরি বজায় থাকে। ফলে পণ্য নষ্ট কম হয় এবং ভালো বাজারমূল্য পাওয়া যায়।

বিভিন্ন উদ্যান ফসলের ফল, পাতা, কুঁড়ি, অঙ্কুর, মূল, কাণ্ড, কলি ও ফুল ইত্যাদি অংশ আমরা ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করি। ফসল সংগ্রহের জন্য আমাদের বাণিজ্যিক পরিপক্কতাকে বিবেচনা করতে হয়। বাণিজ্যিক পরিপক্কতা বলতে ফসলের ব্যবহার্য অংশের এমন অবস্থানে বোঝায় যখন মানুষ তা খাওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারে। যেমন– শসা, লাউ, কুমড়া, বেগুন, শিম, বরবটি, ঢেড়শ, পাতাজাতীয় সবজি ইত্যাদি আমরা বাড়ন্ত অবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে সংগ্রহ ও বাজারজাত করি। ফলকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরনের ফল গাছ থেকে তোলার পর ফলের মধ্যে শর্করা থেকে চিনিতে রূপান্তর বন্ধ হয়ে যায়। যেমন– জাম্বুরা, লেবু, আঙ্গুর, লিচু ইত্যাদি। এসব ফল পাকার পরই তোলা উচিত। আবার আম, কাঁঠাল, পেঁপে, কলা, বেল ইত্যাদি ফল গাছ থেকে তোলার পরও শর্করা থেকে চিনিতে রূপান্তর হতে থাকে, সুগন্ধ ছড়ায় ও রং ধারণ করে। এসব ফল পাকার আগে গাছ থেকে পাড়া হয়।

ভালো বাজারমূল্য পাওয়ার জন্য উদ্যান ফসল যথাযথভাবে সংগ্রহ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছাঁটাই, বাছাই, প্যাকিং ও পরিবহন করা প্রয়োজন। সঠিকভাবে এ কাজ না করলে পণ্য থেকে বাষ্পীভবন, প্রস্বেদন ও শ্বসনের মাধ্যমে পানি বের হয়ে কুঁচকে যেতে পারে, তাপমাত্রা বাড়ার ফলে শ্বসন বেড়ে গিয়ে কোষ-কলা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং রোগ-জীবাণুর আক্রমণে পণ্য পচে যেতে পারে। এসব ক্ষতি থেকে পণ্যকে রক্ষার জন্য আমাদের নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে-

১. ফসল তোলার সময় : ফসল তোলার জন্য আমাদের বাণিজ্যিক পরিপক্বতাকে বিবেচনা করে সঠিক সময়ে ফসল তুলতে হবে।

২. ফসল তোলার পদ্ধতি : উদ্যান ফসল সাধারণত দুভাবে তোলা হয়, যথা– ক) হাত দিয়ে এবং খ) যন্ত্রের সাহায্যে। ফসল সংগ্রহের সময় নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে–

- সাবধানে তুলতে হবে যেন গাছের বা তোলা ফসলের কোনোটার ক্ষতি না হয়।
- তোলার সময় হাতের নখ, ছুরি বা যন্ত্রের আঘাতে ফসলের গায়ে ক্ষত সৃষ্টি করা, গাছ মোচড়ানো, মাটিতে ফেলে দেওয়া, গায়ে মাটি লাগানো, সূর্যের তাপ লাগানো ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

৩. ফসল রাখার পাত্র : ক্ষেত থেকে ফসল তুলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাত্রে রাখতে হবে। পাত্র এমন হতে হবে যেন পণ্যের কোনো ক্ষতি না হয়। আমরা ফসল রাখার জন্য পাটের বস্তা, প্লাস্টিকের ঝুড়ি, বাঁশ বা বেতের ঝুড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি।
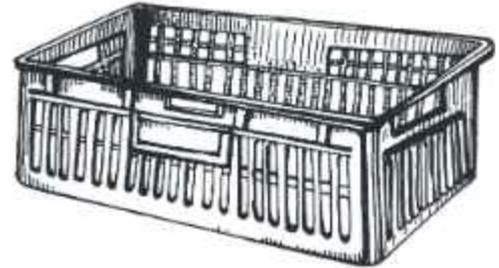
চিত্র : প্লাস্টিক ঝুড়ি

৪. মাঠ থেকে পরিবহন : মাঠ থেকে বাছাই করার স্থানে পণ্য নেওয়ার সময় সতর্ক থাকতে হবে। পণ্যভর্তি পাত্র আছড়ে ফেলা যাবে না। গাদাগাদি করে বোঝাই করা যাবে না। ধীরগতিতে গাড়ি চালাতে হবে যাতে ঝাঁকুনি কম লাগে।

৫. তাপমাত্রা : ক্ষেত থেকে তোলার পর পণ্যকে সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করতে হবে। তাপে পণ্যের উত্তাপ বেড়ে যায়। ফলে গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। পণ্য সকালে বা বিকালে তুলতে হবে। তোলার পর যত দ্রুত সম্ভব মাঠ থেকে সরিয়ে নিতে হবে।

চিত্র : বাঁশের ঝুড়ি

৬. পণ্য বাছাই : পণ্য মাঠ থেকে আনার পর প্রথমে অপ্রয়োজনীয় বা অগ্রহণযোগ্য পণ্য বেছে আলাদা করতে হবে। পরে পণ্যের আকার আকৃতি অনুযায়ী কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে হবে। অতঃপর বাজারজাত করার জন্য পণ্য প্যাকিং করতে হবে। আমরা বস্তা, পলিথিনের শিট, প্লাস্টিকের ঝুড়ি, বাঁশ বা বেতের ঝুড়ি অথবা কাগজের বা কাঠের বাক্সে প্যাকিং করে থাকি। প্যাক করা পণ্য গন্তব্যস্থানে পাঠানোর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অবশ্যই ঠান্ডা স্থানে রাখতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে উদ্যান ফসল সংগ্রহ থেকে শুরু করে বাজারজাত করা পর্যন্ত কোন ধাপে কী করা হয় তা আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : বাণিজ্যিক পরিপক্বতা, পণ্য বাছাই।

পাঠ ৬ : মাঠ ফসল সংগ্রহ ও বাছাই

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা মাঠ ফসল সম্পর্কে জেনেছি। ফসল পাকার পর কাটা থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত অনেক ধাপ পার হয়ে আসতে হয়। এসব ধাপে সঠিক পরিচর্যার অভাবে উৎপাদিত ফসলের মান খারাপ হয়ে যায় অথবা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে চাষিরা ন্যায্য মূল্য পায় না। ফসল কাটা থেকে বাজারজাত করা পর্যন্ত নিম্নলিখিত ধাপগুলোতে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ ক্ষতি সহজেই কমিয়ে আনা যায়-

১. সঠিক সময়ে ফসল কাটা : বীজ ভালোভাবে পাকার পরই ফসল সংগ্রহ করতে হবে অর্থাৎ ফসল পাকার পর কাটতে হবে। তবে ফসল কাটার সময় আবহাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ ঝড়-বৃষ্টির সময় ফসল সংগ্রহ করা যায় না। আবার সংগ্রহ করলেও মাড়াই-ঝাড়াই ও শুকানো যায় না। ফসল জমা করে রাখায় তাপ বেড়ে পচে যেতে পারে, গন্ধ হয়ে যেতে পারে। আবার ঝড়-বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলে পুরোপুরি পাকার আগেই অনেক সময় সংগ্রহ করতে হয়।

ফসল কাটার ১৫-২০ দিন আগে পানি সেচ বন্ধ করে দিতে হবে। এতে ফসলের দৈহিক বৃদ্ধি কম হবে এবং পরিপক্বতা তরান্বিত হবে। ধান কাটার জন্য ফসল সোনালি বর্ণ ধারণ করলে অথবা ৮০% ধান পরিপক্ব হলে ফসল কাটা যাবে। ডাল ও তেল ফসলের ক্ষেত্রে গাছ মরে হলদেভাব হবে। দানা পুষ্ট হলে ফসল কাটা যাবে। তবে বেশি শুকিয়ে গেলে ফসল কাটা ও পরিবহনের সময় দানা ঝরে পড়বে। ধান, গম ফসল কাঁচি দিয়ে বা যন্ত্রের সাহায্যে কাটা যায়।

২. মাড়াইকরণ : কাটা ফসল ভালোভাবে শুকিয়ে নিলে দ্রুত মাড়াই করা যায়। মাড়াইয়ের সময় দানা নষ্ট হয় না। ধান-গম মাড়াই করার জন্য পা বা শক্তিচালিত মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আবার অনেক সময় ড্রাম বা মাচার উপর হাত দিয়ে পিটিয়েও দানা আলাদা করা যায়। মাড়াইয়ের স্থানটি ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে। ডাল ও তেল ফসল মাড়াই করার আগে খুব ভালো শুকিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। ফসলের পরিমাণ বেশি হলে গরু দিয়ে ফসল মাড়াই করা হয়। অন্যথায় লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ফসল মাড়াই করা হয়।

৩. ঝাড়াই : ফসল মাড়াই করার পর ফসলের পরিত্যক্ত অংশ দানা থেকে আলাদা করে প্রথমে হালকাভাবে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। অতঃপর কুলা, বাতাস বা শক্তিচালিত ফ্যানের সাহায্যে দানা ঝাড়াই করা হয়। ঝাড়াই করার ফলে দানা থেকে খড়-কুটা, চিটা ও অন্যান্য আবর্জনা বাছাই হয়ে যায়।

৪. ফসল শুকানো : মাড়াই-ঝাড়াই করার পর দানা ভালোভাবে শুকাতে হবে। দানা শুকানোর মাধ্যমে দানার মধ্যে আর্দ্রতাকে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে আনতে হবে। দানাকে ২-৩টি রোদে এমনভাবে শুকাতে হবে যেন দাঁত দিয়ে চাপ দিলে 'কট' করে শব্দ হয়। এ অবস্থায় দানায় আর্দ্রতার মাত্রা ১০-১২% এ চলে আসে। এছাড়া আর্দ্রতা মাপার যন্ত্রের সাহায্যেও এ কাজটি করা যায়। গুদামজাত অবস্থায় দানায় আর্দ্রতার মাত্রা বেশি থাকলে বিভিন্ন রোগ ও পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, পচে যেতে পারে বা মান খারাপ হয়ে যেতে পারে।

৫. পরিবহন : শুকানোর পর দানা গরম অবস্থায় বস্তাবন্দি করা ঠিক না। একটু ঠান্ডা হওয়ার পর প্লাস্টিক বা চটের বস্তায় ভর্তি করে গুদাম বা গোলা ঘরে নিয়ে যেতে হয়। ছেঁড়া-ফাটা বস্তা পরিহার করতে হবে। ফসল বেশি হলে গাড়িতে পরিবহন করতে হয়। গাড়িতে উঠানো-নামানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন বস্তা ছিড়ে দানা নষ্ট না হয়।

৬. গুদামজাতকরণ : যে ঘর বা কক্ষে সংগৃহীত ফসল রাখা হয় তাকে গুদামঘর বলে। গুদামঘরের মেঝের একটু উপরে বাঁশ বা কাঠের পাটাতন করে তার উপর ফসল রাখা হয়। আমাদের দেশে চট বা প্লাস্টিকের বস্তা, বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরি ডোল, মাটির মটকা, প্লাস্টিক বা টিনের ড্রামের ভিতর দানাশস্য সংরক্ষণ করা হয়। গুদাম ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এতে পোকা-মাকড় ও ইঁদুরের আক্রমণ কম হয়। দানা রাখার সময় ভাঁজে ভাঁজে শুকানো নিমপাতা দিলে পোকার আক্রমণ হয় না। গুদাম ঘর মাঝে মাঝে পরিদর্শন করতে হবে। দানার আর্দ্রতা পরীক্ষা করে প্রয়োজনে আবার রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

চিত্র : ডোল

চিত্র : চটের বস্তায় সংরক্ষণ

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে মাঠ ফসল সংগ্রহ থেকে শুরু করে গুদামজাত করা পর্যন্ত কোন ধাপে কী করা হয় তা আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

পাঠ ৭ : মাছের মিশ্র চাষের সুবিধা

যেসব প্রজাতির মাছ রাক্ষুসে স্বভাবের নয়, খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করে না, জলাশয়ের বিভিন্ন স্তরে বাস করে এবং বিভিন্ন স্তরের খাবার গ্রহণ করে— এসব গুণের কয়েক প্রজাতির মাছ একই পুকুরে একত্রে চাষ করাকেই মিশ্র চাষ বলে। মিশ্র চাষ করার জন্য কার্প বা রুই জাতীয় মাছ বেশি উপযোগী, যেমন সিলভার কার্প, রুই, কাতলা, কার্পিও ইত্যাদি। আমাদের দেশি কার্প জাতীয় মাছের মধ্যে রুই, কাতলা ও মৃগেল অন্যতম। এরা পুকুরে মিশ্র চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এ মাছগুলো পুকুরে চাষের সুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো-

- এরা জলাশয়ের বিভিন্ন স্তরের খাবার খায় যেমন— কাতলা পুকুরের উপরের স্তরে, রুই মধ্য স্তরে ও মৃগেল নিচের স্তরের খাবার খায়।
- এরা রাক্ষুসে স্বভাবের নয়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো।
- দ্রুত বর্ধনশীল।
- চাষের জন্য সহজেই হ্যাচারিতে পোনা পাওয়া যায়।
- স্বল্প মূল্যের সম্পূরক খাবার খেয়ে বেড়ে ওঠে।
- খেতে সুস্বাদু ও বাজারে চাহিদা আছে।
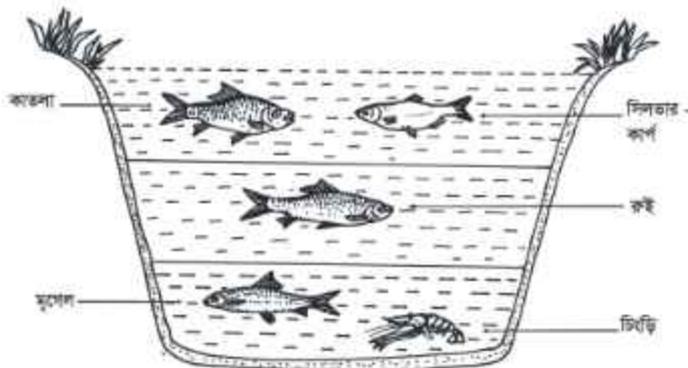
চিত্র : পুকুরে বিভিন্ন স্তরে মাছ

কাজ :
শিক্ষার্থীরা মিশ্র চাষের সুবিধা সম্পর্কে একটি দলগত কাজে অংশগ্রহণ করবে এবং পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।
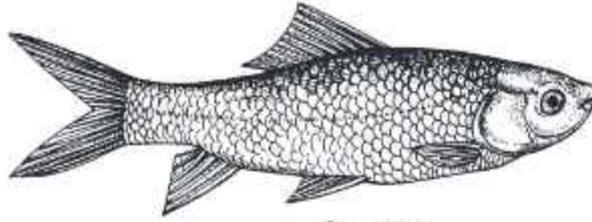
চিত্র : রুই মাছ
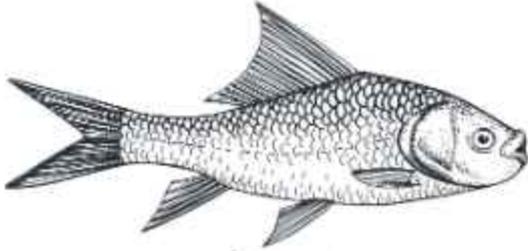
চিত্র : কাতলা মাছ
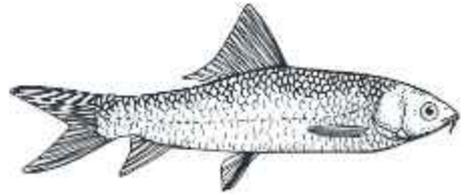
চিত্র : মৃগেল মাছ

মিশ্র চাষের সুবিধা

- মাছ পুকুরের বিভিন্ন স্তরে থাকে ও খাবার খায় বলে পুকুরের সকল জায়গা ও খাবারের সদ্ব্যবহার হয়।
- কোনো স্তরের খাবার জমা হয়ে নষ্ট হয় না। ফলে পুকুরের পরিবেশ ভালো থাকে।
- মিশ্র চাষে মাছের রোগবালাই কম হয়।
- সর্বোপরি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

নতুন শব্দ : কার্প মাছ, হ্যাচারি।

পাঠ ৮ : মিশ্র চাষের জন্য আদর্শ পুকুর

মিশ্র চাষের জন্য উপযোগী পুকুর নির্বাচনে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে তা হচ্ছে-

- পুকুরটি বন্যামুক্ত হবে। এজন্য পুকুরের পাড় অবশ্যই উঁচু ও মজবুত হবে।
- পুকুরের পানির গড় গভীরতা ২-৩ মিটার হবে এবং শুষ্ক মৌসুমে সময় পানির গভীরতা হবে কমপক্ষে ১ মিটার।
- দো-আঁশ, এঁটেল দো-আঁশ বা এঁটেল মাটির পুকুর সবচেয়ে ভালো। কারণ এ মাটির পানি ধারণক্ষমতা বেশি।
- পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম পাড়ে বড়ো গাছ থাকবে না।
- পুকুরটি খোলামেলা হবে যেন প্রচুর আলোবাতাস পায়।

- আয়তন ৩০-৫০ শতক হলে ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়।
- রাক্ষুসে মাছ ও ক্ষতিকারক পোকামাকড় থাকবে না।
- পুকুরে আগাছা থাকবে না।

- পুকুরের তলায় বেশি কাদা থাকবে না।
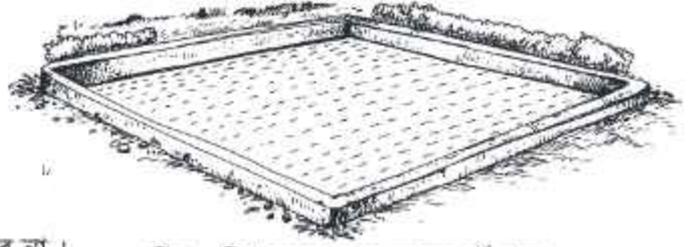
চিত্র : মিশ্র মাছ চাষের জন্য আদর্শ পুকুর

মাছের জীবনধারণের মাধ্যম হচ্ছে পানি। পুকুরের পানির গুণাগুণ মাছ চাষে সরাসরি প্রভাব ফেলে। একটি উৎপাদনশীল পুকুরের পানির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো খেয়াল রাখা প্রয়োজন-

১। গভীরতা : মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য হচ্ছে প্লাংকটন। এটি উৎপাদনের জন্য সূর্যালোক দরকার। পুকুরের পানির গভীরতা বেশি হলে সূর্যালোক পানির অতি গভীরে পৌঁছাতে পারে না। তাই পর্যাপ্ত প্লাংকটন তৈরি হয় না। আবার গভীরতা কম হলে পানি অতিরিক্ত গরম হয়ে যেতে পারে ও পুকুরের তলদেশে আগাছা জন্মাতে পারে।

২। পানির ঘোলাত্ব : পুকুরে ভাসমান কাদা ও মাটির কণা ঘোলাত্ব সৃষ্টি করে। তা ছাড়া বৃষ্টি হলে পুকুরের পানি ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। ফলে পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা পায়, এবং পানিতে খাদ্য তৈরি হয় না। মাছের ফুলকা নষ্ট হয়ে যায়। এ সমস্যা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে প্রতি শতকে ৩০ সে.মি. গভীরতার জন্য ২৪০-২৫০ গ্রাম ফিটকিরি অথবা প্রতি শতকে ১.২ কেজি খড় দেওয়া যেতে পারে।

৩। পানির রং : পানির রং ঘন সবুজ হয়ে যাওয়া বা পানির উপর শেওলার স্তর পড়া মাছের জন্য ক্ষতিকর। প্রতি শতকে ১২-১৫ গ্রাম তুঁতের ছোটো ছোটো পোটলা বেঁধে রাখলে পানিতে ঢেউয়ের ফলে তুঁত পানিতে মিশে শেওলা দমন করে। অতিরিক্ত আয়রন বা লাল শেওলার জন্য পানির উপর লাল স্তর পড়তে পারে। এ জন্য পুকুরে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়। খড়ের বিচালি বা কলাগাছের পাতা পেঁচিয়ে দড়ি তৈরি করে পানির উপর দিয়ে টেনে তা তুলে ফেলা যায়। পানির রং যদি হালকা সবুজ, লালচে সবুজ ও বাদামি সবুজ হয় তবে বোঝা যাবে যে, পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্লাংকটন পরিমিত পরিমাণ আছে।

৪। তাপমাত্রা : পানির তাপমাত্রা কমে গেলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও মাছের খাদ্য গ্রহণের হার কমে যায়। আবার তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খাদ্য গ্রহণের হার বেড়ে যায়। এজন্য শীতকালে সার ও সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দিতে হয়। রুই জাতীয় মাছ ২৫-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সবচেয়ে ভালো হয়।

৫। দ্রবীভূত গ্যাস : মাছ তার শ্বাসকার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন থেকে ফুলকার সাহায্যে গ্রহণ করে। পুকুরে বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ ও শেওলার অতিরিক্ত পচন, মেঘলা আবহাওয়া, ঘোলাত্ব, পানিতে অতিরিক্ত লৌহের উপস্থিতির কারণে অক্সিজেন কমে যায়। সে সাথে কার্বনডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস বেড়ে যায়। অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে মাছ পানির উপর ভেসে মুখ হাঁ করে খাবি খেতে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে পুকুরে বাঁশ পিটিয়ে, সাঁতার কেটে এ অবস্থা দূর করা যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মিশ্র মৎস্য চাষ উপযোগী একটি আদর্শ পুকুরের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করবে ও উৎপাদনশীল পুকুরের পানির বৈশিষ্ট্যগুলো তালিকাভুক্ত করবে।

নতুন শব্দ পরিচিতি : প্লাংকটন, পানির ঘোলাত্ব, ফুলকা, ফিটকারি, লাল শেওলা।

পাঠ ৯ : মিশ্র চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি

ফসল ফলানোর জন্য চারা রোপণের আগে জমি চাষ, সেচ দেওয়া, সার প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিজমি প্রস্তুত করতে হয়। পুকুরে পোনা ছাড়ার আগেও তেমনি পুকুর প্রস্তুত করে নিতে হয়। মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতির ধাপগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো-

১। পুকুরের পাড় ও তলদেশ মেরামত : পুকুরের পাড় ভাঙা থাকলে তা উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে। পাড়ে বড়ো গাছপালা থাকলে তার ডাল ছেঁটে দিতে হবে। এতে করে পুকুরে সূর্যের আলো পড়বে ও প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হবে। পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদা থাকলে বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হয়। ৩-৪ বছর পর পর একবার পুকুর শুকিয়ে তলার অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলা উচিত ও রোদে পুকুর কয়েকদিন শুকানো উচিত।

২। আগাছা পরিষ্কার : পুকুরে জলজ আগাছা যেমন- কচুরিপানা, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি পানিতে মাছের খাদ্য প্লাংকটনের পুষ্টি শোষণ করে নেয় ও পুকুরে সূর্যের আলো পড়তে বাধা দেয়। তাই পুকুরে সব ধরনের জলজ আগাছা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

৩। রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ অপসারণ : শোল, গজার, চিতল, বোয়াল ইত্যাদি চাষের মাছ বা পোনা খেয়ে ফেলে। আবার চাষকৃত প্রজাতি ছাড়া অন্য মাছ চাষকৃত মাছের সাথে খাদ্যের জন্য প্রতিযোগিতা করে। পুকুরের পানি শুকিয়ে এসব মাছ ধরে ফেলা যায়। পুকুরে পানি কম থাকলে বারবার জাল টেনেও তা করা যায়। পুকুরে ১ ফুট বা ৩০ সে. মি. গভীরতার জন্য প্রতি শতকে ৩০-৩৫ গ্রাম মাছ মারার বিষ রোটেনন পাউডার পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর জাল টেনে পুকুরের পানির উলটপালট করে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পর সমস্ত মাছ পানির উপর ভেসে উঠলে তা তুলে ফেলতে হবে।

২০২৫
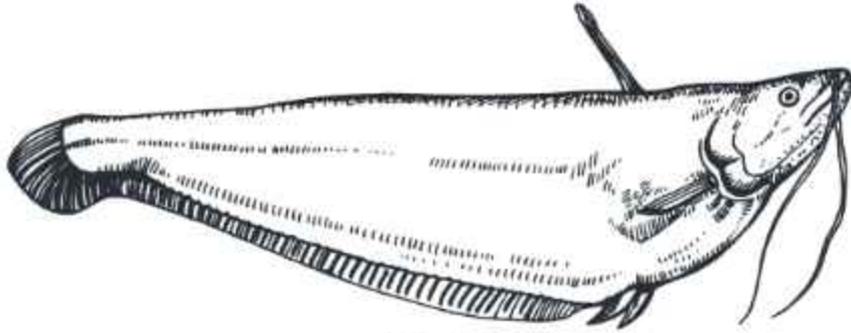
চিত্র : বোয়াল মাছ
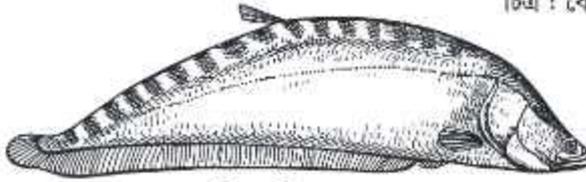
চিত্র : চিতল মাছ

চিত্র : শোল মাছ

৪। চুন প্রয়োগ : পুকুর শুকনা হলে প্রতি শতকে ১-২ কেজি পরিমান চুন পাউডার তলায় ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুরে পানি থাকলে বালতি বা ড্রামে গুলে ঠাণ্ডা করে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন মাটি ও পানি জীবাণুমুক্ত করে ও উর্বরতা বৃদ্ধি করে, পানির ঘোলাটে অবস্থা দুর করে এবং তলদেশের বিষাক্ত গ্যাস দুর করে।

৫। সার প্রয়োগ : পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির জন্য সার প্রয়োগ করতে হয়। চুন প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর সার দিতে হবে। জৈব সারের জন্য পুকুরে প্রতি শতকে ৫-৭ কেজি গোবর এবং অজৈব সারের মধ্যে প্রতি শতকে ১০০-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০-৭৫ গ্রাম টিএসপি ও ২০-৩০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে সাথে নিয়ে পার্শ্ববর্তী কোনো পুকুরের পাড়ে গিয়ে পুকুরের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি পরীক্ষা করবে।

পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা : সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে। এজন্য ২০ সে.মি. ব্যাসযুক্ত টিনের তৈরি একটি সাদা-কালো থালা (সেকিডিস্ক) সুতা দ্বারা পানিতে ডোবানোর পর যদি ২৫-৩০ সে.মি. গভীরতায় থালা না দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে।

অথবা হাতের কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে যদি হাতের তালু না দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পরিমিত প্রাকৃতিক খাদ্য রয়েছে। অন্যথায় পুনরায় কিছু সার দিয়ে ২-৩ দিন পর প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কি না দেখতে হবে।
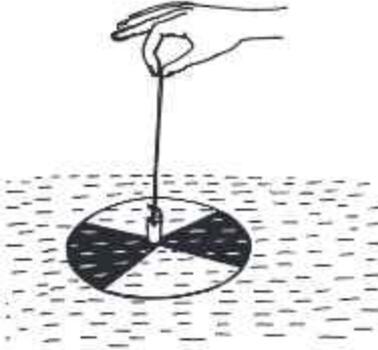
চিত্র : সেকিডিস্ক পরীক্ষা
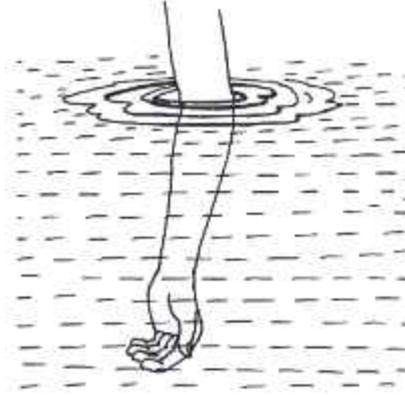
চিত্র : হাত পরীক্ষা

নতুন শব্দ : সেকিডিস্ক, হাত পরীক্ষা।

পাঠ ১০ : পোনা মজুদ এবং মজুদ পরবর্তী পরিচর্যা

পোনা মজুদ : পুকুরে পোনা ছাড়ার জন্য নিকটবর্তী কোনো সরকারি বা বেসরকারি হ্যাচারি বা নার্সারি খামার থেকে পোনা সংগ্রহ করতে হবে। কাছাকাছি স্থানে মাটির হাঁড়ি বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে পোনা পরিবহন করা যায়। দূরবর্তী স্থানের ক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে পোনা পরিবহন করা উচিত। পোনা এনে সরাসরি পুকুরে ছাড়া উচিত নয়। পোনা ভর্তি পলিব্যাগ বা পাত্র পুকুরের পানিতে ১৫-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে। এ সময় অল্প অল্প করে পলিথিনে বা পাত্রে পুকুরের পানি মেশাতে হবে। এতে করে পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা প্রায় সমান হবে। এরপর পলিব্যাগ বা পাত্র কাত করে পোনা আস্তে আস্তে পুকুরে ছাড়তে হবে। সকালে বা বিকালে বা দিনের ঠান্ডা আবহাওয়ায় পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে। পুকুরে ৭-১০ সে.মি. আকারের পোনা শতকে ২৫-৪০টি মজুদ করা যায়। কাতলা ১০-১৬টি, রুই ৭-১২টি, মৃগেল ৭-১২টি মজুদ করা যেতে পারে। এ সকল মাছের সাথে অন্য বিদেশি মাছ চাষ করা হলে সেক্ষেত্রে সিলভার কার্প ৭-১২টি, কাতলা ৩-৪টি, রুই ৫-৮টি, মৃগেল ৬-১০টি, কার্পিও ১-২টি ও গ্রাস কার্প ২-৪টি ছাড়তে হবে। তা ছাড়া প্রতি শতকে অতিরিক্ত ১০-১৫টি সরপুটির পোনা মজুদ করা যায়।

মজুদ পরবর্তী পরিচর্যা

১। সার প্রয়োগ : পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য না থাকলে মাছের বৃদ্ধি ভালো হয় না। তাই পুকুরে দৈনিক অথবা প্রতি সপ্তাহে একবার নিয়মিত সার দেওয়া উচিত। সার পানির সাথে গুলে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

চিত্র : পুকুরে পোনা ছাড়ার নিয়ম

পুকুরে সার প্রয়োগের তালিকা

সারের নাম	মাত্রা (শতকে সপ্তাহে)
গোবর	২-২.৫ কেজি
ইউরিয়া	৪০-৫০ গ্রাম
টিএসপি	২০-২৫ গ্রাম

২। সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ : পুকুরে পোনা মজুদের পর থেকেই দৈনিক সম্পূরক খাবার সরবরাহ করতে হবে। সুষম খাবার তৈরির জন্য ফিশমিল, সরিষার খৈল, গমের ভুসি/ চালের কুঁড়া, আটা ও ভিটামিন যথাক্রমে ২০ : ৩০ : ৪৫ : ৪.৫ : ০.৫ অনুপাতে মিশিয়ে খাবার তৈরি করে মাছকে দেওয়া যায়। খাবার দেওয়ার ১০-১২ ঘন্টা আগে খৈল ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর ভেজা খৈলের সাথে বাকি উপাদানগুলো অল্প পানি দিয়ে মিশিয়ে মণ্ড তৈরি করে বল আকারে পুকুরের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে দিতে হবে। দিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য সমান দুইভাগে ভাগ করে সকালে ও বিকালে দিতে হবে। এ ছাড়া বাজার থেকে কেনা কারখানায় তৈরি মৎস্য খাদ্যও পুকুরে সরবরাহ করা যেতে পারে। পুকুরে প্রতিদিন মজুদকৃত মাছের মোট ওজনের ২-৫ ভাগ এবং শীতের সময় ১-২ ভাগ খাবার দিলেই চলে।

৩। মাছের রোগ ব্যবস্থাপনা : পুকুরে মাছ চাষের সময় বিভিন্ন কারণে মাছের রোগ হতে পারে। পুকুরের পরিবেশ খারাপ হলে মাছ সহজেই রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় ও মারা যেতে পারে। ফলে মাছ চাষ লাভজনক হয় না। চাষকালীন সময়ে মাছের ক্ষতরোগ, লেজ ও পাখনা পচা রোগ, পেটফোলা রোগ এবং মাছের দেহে উকুনের আক্রমণ হতে পারে। রোগ হলে মাছ পানির উপরিভাগে অস্বাভাবিকভাবে সাঁতার কাটে, খাবার গ্রহণ কমিয়ে দেয় বা বন্ধ করে দেয়, ফুলকার রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়, মাছের দেহে বিভিন্ন দাগ বা ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। মাছে রোগ দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগাক্রান্ত মাছ পুকুর হতে সরিয়ে ফেলতে হবে।

প্রাথমিকভাবে পুকুরে শতকে ১ কেজি চুন বা ২৫-৩৫ গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দেওয়া যেতে পারে। অথবা ১০ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম লবণ গুলিয়ে তাতে মাছগুলোকে ১ মিনিট গোসল করিয়ে আবার পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে।

কাজ : শিক্ষক শ্রেণিতে মিশ্র মাছ চাষে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের উপর ভিডিয়ো দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে কাজ প্রদান করবেন।

মাছ আহরণ : রুই, কাতলা, মৃগেল মাছ ১ বছর বয়স পর্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এরপর খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও দৈহিক বৃদ্ধি সে হারে ঘটে না। এ জন্য নির্দিষ্ট বয়সে মাছ ধরে ফেলতে হবে। তা না হলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। কাতলা ৭-১২ মাসের মধ্যে ওজনে ১-১.৫ কেজি হয়, রুই ও মৃগেল মাছ ৯-১২ মাসের মধ্যে ওজন ৭০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি পর্যন্ত হয়।

নতুন শব্দ : পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট।

পাঠ ১১ : চিংড়ি চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি

চিংড়ি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যসম্পদ। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ আসে হিমায়িত চিংড়ি থেকে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পোশাকশিল্পের পরেই চিংড়ির স্থান। চিংড়িশিল্পের কাঁচামাল যেমন- চিংড়ির পোনা এ দেশের প্রাকৃতিক উৎস ও হ্যাচারি থেকে সহজেই পাওয়া যায়। তাই এ শিল্পে স্বল্প ব্যয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়। চিংড়ি চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব। এ দেশের মিঠা ও লোনা পানিতে প্রায় ৬০ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। এদের সবগুলোই লাভজনকভাবে চাষোপযোগী নয়। আমাদের দেশে বাণিজ্যিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাষোপযোগী মিঠাপানির চিংড়ি প্রজাতিটি হচ্ছে গলদা চিংড়ি এবং লোনাপানির প্রজাতিটি হচ্ছে বাগদা চিংড়ি।

গলদা চিংড়ির মাথা ও দেহ প্রায় সমান। পুরুষ গলদার ২য় জোড়া পা বেশ বড়ো। অপরদিকে বাগদা চিংড়ির মাথা দেহের থেকে ছোট হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে চাষের মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার মে.টন। এখানে আমরা মিঠা পানিতে গলদা চিংড়ি চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানব। গলদা একক চাষ ছাড়াও কার্প জাতীয় মাছের সাথে মিশ্রচাষ করা যায়।

গলদা চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন : ছোট বড় সব পুকুরেই গলদা চিংড়ি চাষ করা যায়। তবে বড় পুকুর গলদা চিংড়ি চাষের জন্য সুবিধাজনক। গলদা চাষের জন্য নির্বাচিত পুকুরে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা প্রয়োজন-

- পুকুরটি খোলামেলা হবে যেন পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পায়।
- পুকুরের মাটি এঁটেল, দোঁ-আশ বা বেলে দোঁ-আশ হলে ভালো হয়।
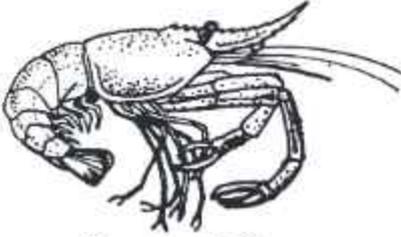
চিত্র : গলদা চিংড়ি

চিত্র : বাগদা চিংড়ি

- পুকুরের পানির গভীরতা ১-১.২ মিটার হওয়া দরকার।
- পুকুরে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- পুকুর বন্যামুক্ত হতে হবে।
- পুকুরের পানি দূষণমুক্ত হতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক ফসল হিসেবে চিংড়ির গুরুত্ব দলগতভাবে লিখে উপস্থাপন করবে।

পুকুর প্রস্তুতি : আমরা আগের অধ্যায়ে মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি সম্পর্কে জেনেছি। মিঠা পানিতে চিংড়ি চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতিও প্রায় অনুরূপ। নিচে সংক্ষেপে চিংড়ি চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতির বিভিন্ন ধাপ উল্লেখ করা হলো-

১। পুকুরের পাড় ভাঙা থাকলে তা মেরামত করতে হবে এবং তলদেশের অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলতে হবে।

২। রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ থাকলে পুকুর শুকিয়ে অথবা রোটেনন ব্যবহার করে তা অপসারণ করতে হবে।

৩। পুকুরের ভাসমান ও অন্যান্য জলজ আগাছা দূর করতে হবে।

৪। পুকুরে শতকে ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন মাটি ও পানির অম্লতা দূর করে, পানির ঘোলাত্ব দূর করে ও সারের কার্যকারিতা বাড়ায়।

৫। চুন দেওয়ার ৭-১০ দিন পর পুকুরে সার প্রয়োগ করতে হবে। পুকুর প্রস্তুতিকালীন সারের পরিমাণ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আমরা আগের অধ্যায়ে জেনেছি।

পাঠ ১২ : পোনা মজুদ ও মজুদ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

সার দেওয়ার ৩-৫ দিন পর পুকুরের পানির রং হালকা সবুজ হলে পোনা মজুদ করতে হবে। পোনা মজুদের একদিন আগে গলদা চিংড়ির জন্য আশ্রয়স্থল স্থাপন করতে হবে। কারণ চিংড়ি একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর খোলস বদলায়। খোলস ছাড়ার মাধ্যমেই চিংড়ির বৃদ্ধি ঘটে। খোলস বদলের সময় চিংড়ি দুর্বল থাকে। এ সময় চিংড়ি নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে চায়। এ জন্য নারিকেল, তাল, খেজুর গাছের শুকানো পাতা, ডালপালা ও বাঁশের টুকরো পুকুরের তলদেশে স্থাপন করতে হয় যা চিংড়ির আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করে।

প্রাকৃতিক উৎস বা হ্যাচারি হতে সংগৃহীত ১০-১৫ মিলি. মি.আকারের পোনা পানির সাথে খাপ খাইয়ে সাবধানে পুকুরে ছাড়তে হবে। অত্যধিক রোদ বা বৃষ্টির মধ্যে পোনা মজুদ করা উচিত নয়। একক চাষের ক্ষেত্রে প্রতি শতকে ৪০-১২০টি চিংড়ির পোনা ছাড়া যায়। মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে শতক প্রতি চিংড়ি ৪৮টি, সিলভার কার্প ৬টি, রুই ৭টি, কাতলা ৭টি, গ্রাস কার্প ১টি ও সরপুটি ৯টি ছাড়া যায়।

পানির অবস্থা পর্যবেক্ষণ : পুকুরে পোনা মজুদের পর নিয়মিত পানির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দুই-তিন মাস পর পুকুরের পানি বেশি সবুজ হলে অথবা চিংড়ির অস্বাভাবিক আচরণ দেখা গেলে পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ : প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য পুকুরে সার দেওয়া দরকার। এ জন্য পুকুরে প্রতিদিন শতক প্রতি গোবর ১৫০-২০০ গ্রাম, ইউরিয়া ৩-৫ গ্রামটি, এসপি ১-২ গ্রাম ও এমওপি ০.৫-১ গ্রাম দেওয়া যেতে পারে। সকালে সূর্যের আলো পড়ার পর সার প্রয়োগ করতে হবে। পানির রং অতিরিক্ত সবুজ হলে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা : চিংড়ির ভালো উৎপাদন পাওয়ার জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাবার দেওয়া দরকার। সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য চালের কুঁড়া বা গমের ভুসি, খৈল, ফিশমিল, শামুক বা ঝিনুকের খোলসের গুঁড়া, লবণ ও ভিটামিন মিশ্রণ একসাথে মিশিয়ে বল তৈরি

করে পুকুরে দেওয়া যায়। পুকুরে বিদ্যমান চিংড়ির মোট ওজনের ৩-৫ ভাগ হারে প্রতিদিন খাদ্য দিতে হবে। এ ছাড়া শামুক বা ঝিনুকের মাংস কুচি কুচি করে কেটে প্রতিদিন একবার করে দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। বল আকারে তৈরি ভেজা খাদ্য পুকুরের নির্দিষ্ট স্থানে খাদ্যদানিতে করে দিতে হবে। প্রতিদিনের খাবারকে দুইভাগ করে সকালে ও সন্ধ্যায় পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

চিংড়ির সম্পূরক খাদ্যতালিকা

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ (%)
১	চালের কুঁড়া বা গমের ভুসি	৪০-৬০
২	খৈল	১০-২০
৩	ফিশমিল	২০-৩০
৪	শামুক বা ঝিনুকের খোলসের গুঁড়া	৯.৫
৫	লবণ	০.২৫
৬	ভিটামিন মিশ্রণ	০.২৫

কাজ : চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য ও সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা দলগতভাবে আলোচনা করে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

রোগ প্রতিরোধ : দূষিত পরিবেশ, রোগাক্রান্ত পোনা মজুদ, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে চিংড়িতে রোগ হতে পারে। তবে রোগবালাইয়ের প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থাই উত্তম। সুস্থ-সবল পোনা মজুদ ও ভালো ব্যবস্থাপনা করা গেলে রোগের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। চাষকালীন চিংড়ির কয়েকটি সাধারণ রোগ হচ্ছে খোলস, লেজ ও ফুলকায় কালো দাগ রোগ, খোলস নরম রোগ, চিংড়ির গায়ে শেওলা সমস্যা, পেশি সাদা ও হলদে হয়ে যাওয়া। চিংড়িতে রোগ দেখা দিলে প্রথমেই দ্রুত পানি পরিবর্তন করে নতুন পানি দিতে হবে। পুকুরের পানিতে শতকে ১ কেজি পরিমাণ পাথুরে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

নতুন শব্দ : চিংড়ির আশ্রয়স্থল, ফিশমিল।

পাঠ ১৩ : মাছ সংগ্রহ ও বাছাই

মাছ দ্রুত পচনশীল দ্রব্য। মাছ ধরার পর তার গুণগত মান ভালো রেখে ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর জন্য সতর্কতার সাথে সংগ্রহ, বাছাই ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। তাজা মাছকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করলে দ্রুত পচনক্রিয়া ঘটে। মাছ সংগ্রহ ও বাছাইয়ের সময় যত্নসহকারে নাড়াচাড়া করতে হয় যেন মাছ আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।

মাছের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এমন হতে হবে যেন সহজেই ধুয়ে পরিষ্কার করা যায় এবং মাছকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। আঘাত পাওয়া মাছ, পচা বা রোগাক্রান্ত মাছ দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে। মাছকে সূর্যালোকের নিচে দীর্ঘক্ষণ রাখা উচিত নয়। বড়ো মাছের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে রক্ত ঝরতে দিতে হবে। এ জন্য মাছের উপর পানির প্রবাহ দেওয়া যেতে পারে। মাছকে ব্লিচিং পাউডার যুক্ত পানি দিয়ে ধুয়ে নিলে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংক্রমণের আশঙ্কা অনেক কমে যায়। এ জন্য পানিতে লিটার প্রতি ২৫-৩০ মিলিগ্রাম ব্লিচিং পাউডার মেশাতে হয়। ব্লিচিং পাউডার পাওয়া না গেলে পরিষ্কার ট্যাপ বা টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করতে হবে।

বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মাছকে প্রজাতি ও আকার অনুযায়ী আলাদা করা যায়। আবার মাছের গুণাগুণের উপর ভিত্তি করেও একে বিভিন্ন মান বা গ্রেডে ভাগ করা যায়। যেমন-

গ্রেড	বাহ্যিক অবস্থা	পেশি	ফুলকা	চোখ	মান বা গ্রেড
১	উজ্জ্বল ও চকচকে স্বাভাবিক রং	দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ আঙুলে চাপ দিলে সাথে সাথে ফিরে আসে	গাঢ় লাল	উজ্জ্বল, চকচকে ও লেন্স উঁচু স্বচ্ছ	উত্তম
২	ঔজ্জ্বল্য নেই, হালকা লালচে হলুদ	শক্ত ও চাপ দিলে ডেবে যায় না	বাদামি বা ধূসর	চোখ বিবর্ণ ও ঢোকানো, পাতা ঘোলাটে, সামান্য রক্তাভ	মাঝারি বা সন্তোষজনক
৩	লালচে হলুদ	পেশি সামান্য নরম, চাপ দিলে দেবে যায়	বাদামি বা সাদাটে, দুর্গন্ধযুক্ত	বিবর্ণ ও ডোবানো চোখের পাতা, ঘোলাটে, রক্তময়	নিম্নমান

কাজ : শিক্ষক বাজার থেকে একই মাছের বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীর সাহায্যে সেগুলোর গুণাগুণ পরীক্ষা করে বিভিন্ন মান বা গ্রেডে বিভক্ত করাবেন।

মাছ সংগ্রহ বা বাছাইয়ের পর বরফের সাহায্যে সংরক্ষণ করে বাজারজাত করা হয়। আমাদের দেশে মাছ সংরক্ষণের জন্য বরফের ব্লককে গুঁড়া করে ব্যবহার করা হয়। প্রতি ১ ভাগ মাছের জন্য ২ ভাগ বরফ দিতে হয় এবং শীতকালে প্রতি ১ ভাগ মাছের জন্য ১ ভাগ বরফ দিলেই চলে। আমাদের দেশে প্রচলিত পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাঁশের চাটাই কিংবা মাদুরের তৈরি ঝুড়িতে বরফ ও মাছ স্তরে স্তরে সাজিয়ে একটি মাদুর বা চটের টুকরো দিয়ে ঢেকে সেলাই করে দেওয়া হয় এবং পরে কাঠের বাক্সে

দূরবর্তী স্থানে পরিবহন করা হয় । দূরে মাছ পরিবহনের জন্য শীতলীকৃত ভ্যান ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো । কাছাকাছি পরিবহনের জন্য তাপ প্রতিরোধী বরফ বাক্স ব্যবহার করা প্রয়োজন ।

নতুন শব্দ : ব্লিচিং পাউডার, সংক্রমণ, স্থিতিস্থাপক ।

পাঠ ১৪ : গরু পালন পদ্ধতি ও পরিচর্যা

গবাদিপশুর দুধ ও মাংস উৎপাদন লাভজনক করার জন্য সুবিধা মতো পালন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় । আমাদের দেশে সনাতন পদ্ধতিতে গরু পালন করা হয় । এখানে সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না । কৃষক সাধারণত পশুকে গোয়ালে রেখে, কখনো খুঁটি দিয়ে বেঁধে বা চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়ে পালন করে থাকে । তাই তিন পদ্ধতিতে পশু পালন করা যায় ।

১ । গোয়ালঘরে পালন ২ । বাইরে বেঁধে পালন ৩ । চারণভূমিতে পালন

গোয়াল ঘরে রেখে পালন : আধুনিক গোয়ালঘর তৈরি করে পশুকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা যায় । গোয়াল ঘর তৈরি করার সময় পশুর সংখ্যার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে । পশুর সংখ্যা ৯ বা তার কম হলে এক সারিবিশিষ্ট ঘর এবং ১০ বা তার বেশি হলে দুই সারিবিশিষ্ট ঘর তৈরি করতে হবে । ঘর তৈরির সময় প্রতিটি গরুর জন্য খাদ্য সরবরাহের পথ, চাড়ি, পশু দাঁড়ানোর স্থান, নর্দমা ও পশু চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে । এখানে পশুকে তার প্রয়োজনীয় সকল খাদ্য, যেমন- কাঁচা ঘাস, খড়, খৈল, ভুসি ও পানি সরবরাহ করা হয়। পশুকে চারণভূমি বা বাইরে বাঁধার জায়গা না থাকলে এ পদ্ধতিতে গবাদিপশু পালন করা হয় । এখানে পশু কম আলো বাতাস পায় এবং সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত হয় ।

বাইরে বেঁধে পালন : গোয়াল ঘরে পশুকে সবুজ ঘাস সরবরাহ করা সম্ভব না হলে বিকল্প বিষয় চিন্তা করতে হয় । এক্ষেত্রে সবুজ ঘাস রয়েছে এমন রাস্তা, বাগান বাড়ি বা মাঠে গরুকে বেঁধে ঘাস খাওয়ানো যায়। পশুকে শক্তভাবে বাঁধতে না পারলে অন্যের জমির ফসল নষ্ট করে থাকে। তাই পশু পালনকারীকে এদিকে খেয়াল রাখতে হবে ।

চারণভূমিতে পালন : যেসব দেশে অনেক কৃষিজমি রয়েছে সেখানে তারা পশুর জন্য উন্নত জাতের ঘাসের চাষ করে থাকে। সাধারণত গোসম্পদে উন্নত দেশগুলোই পরিকল্পিতভাবে পশুর জন্য চারণভূমি তৈরি করে থাকে। পশু তার প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাস চারণভূমিতে চরে খেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে খৈল, ভুসি ও পানি গোয়ালঘরে সরবরাহ করা হয়ে থাকে ।
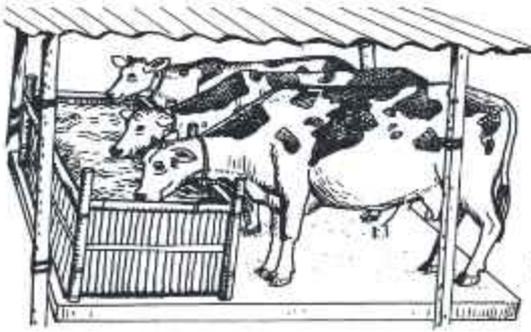
চিত্র : গোয়ালঘরে পালন
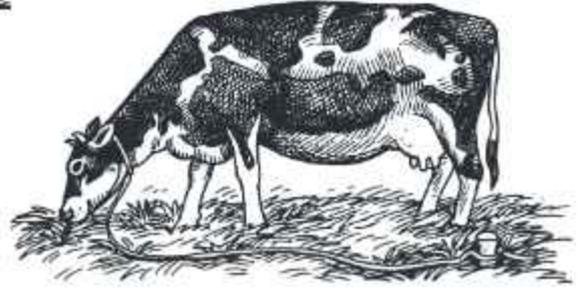
চিত্র : বাইরে বেঁধে পালন
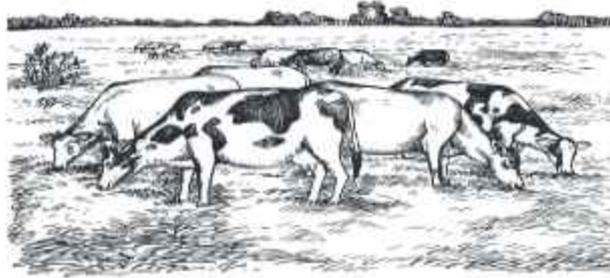
চিত্র : চারণভূমিতে পালন

কাজ : তোমাদের এলাকায় কোন পদ্ধতিতে গরু পালন করা হয় তা উল্লেখপূর্বক এর সুবিধা বা অসুবিধা লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর ।

পশুর পরিচর্যা : পশুকে আদর-যত্নের সাথে লালন-পালন করতে হয় । পশুর সার্বিক যত্নকে পরিচর্যা বলে । দুধেল গাভীর দৈনন্দিন পরিচর্যার অভাব হলে দুগ্ধ উৎপাদন কমে যায় । খামারের বাছুর, বাড়ন্ত গরু ও গর্ভবতী পশুর বিশেষ যত্ন নিতে হয় । পশুর সঠিক পরিচর্যার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে -

- প্রতিদিন পশুর গোবর, মূত্র ফেলে দিয়ে বাসস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ।
- চাড়ি থেকে বাসি খাদ্য ফেলে দিয়ে তাজা খাদ্য সরবরাহ করতে হবে ।
- প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিষ্কার পানি সরবরাহ করতে হবে ।
- পশুর শরীর পরিষ্কার রাখার জন্য নিয়মিত গোসল ও প্রয়োজনে ব্রাশ করতে হবে ।
- পশুকে প্রজনন, গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন যত্ন নিতে হবে ।

- দোহনকালে গাভীকে বিরক্ত করা যাবে না।
- বাছুরের বিশেষ যত্ন নিতে হবে এবং বাছুর যাতে পরিমিত দুধ পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

নতুন শব্দ : সনাতন পদ্ধতি, পরিচর্যা, গর্ভকালীন, প্রসবকালীন।

পাঠ ১৫ : গরু পালনের জন্য একটি আদর্শ গোয়ালঘর

মানুষের মতো পশুপাখিদের আশ্রয়ের প্রয়োজন রয়েছে। সুস্থভাবে বাঁচা এবং অধিক উৎপাদনের জন্য পশুর ঘর তৈরি করতে হয়। পশুর থাকা খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য যে আরামদায়ক ঘরে আশ্রয় দেওয়া হয় তাকে গোয়াল ঘর বলে। গোয়ালঘরে পশুকে ২৪ ঘন্টা আবদ্ধ না রেখে মাঝে মধ্যে আলো বাতাসে ঘুরিয়ে আনা পশুর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

একটি আদর্শ গোয়ালঘরের স্থান নির্বাচন : পারিবারিক বা বাণিজ্যিক যে উদ্দেশেই গরু পালন করা হোক না কেন খামারিকে গোয়ালঘরের স্থান নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে –

- গোয়ালঘর উঁচু স্থানে করতে হবে।
- পশুর সংখ্যার বিষয়টি মনে রাখতে হবে।
- গোয়ালঘর মানুষের বাসস্থান থেকে দূরে হবে।
- গোয়ালঘর বা খামার এলাকা থেকে সহজে পানি নিষ্কাশন হতে হবে।
- গোয়ালঘরের চারপাশ পরিষ্কার হবে।
- গোয়ালঘরে যেন সূর্যের আলো পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- পশুর জন্য খাদ্য ও পানি সরবরাহের বিষয়টি মনে রাখতে হবে।
- বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গোয়ালঘর তৈরির সময় বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করতে হবে।

পশুর বাসস্থান বা গোয়ালঘরের অনেক সুবিধা রয়েছে। গোয়ালঘরে একক বা দলগতভাবে পশু পালন করলে ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ হয় ও উৎপাদন খরচ কমে আসে। নিম্নে গোয়ালঘর বা খামারে পশু পালন করার সুবিধাসমূহ বর্ণনা করা হলো–

- পশুর একক ও নিবিড় যত্ন নেওয়া সহজ হয়।
- পশু থেকে অধিক দুধ ও মাংস পাওয়া যায়।
- রোদ, বৃষ্টি ও ঝড় থেকে পশুকে রক্ষা করা যায়।
- পোকামাকড় ও বন্য পশুপাখি থেকে রক্ষা করা যায়।

- দুগ্ধ দোহন সহজ হয়।
- গোয়ালঘরে রাখার কারণে পশু শান্ত হয়ে ওঠে।
- রোগ প্রতিরোধ সম্ভব হয়।
- চিকিৎসাসেবা সহজ হয়।
- সহজে গোয়ালঘর পরিষ্কার করা যায়।
- গোবর ও অন্যান্য বর্জ্য সংরক্ষণ করা সহজ হয়।
- শ্রমিক কম লাগে ও উৎপাদন খরচ কমে আসে।

গোয়ালঘরের আকার পশুর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। পশুর সংখ্যা ১০ এর কম হলে এক সারিবিশিষ্ট ঘর এবং ১০ বা তার অধিক হলে দুই সারিবিশিষ্ট ঘর তৈরি করতে হবে।
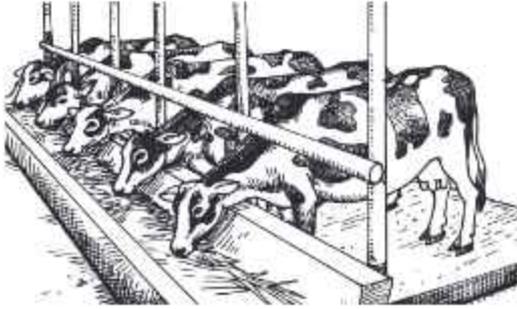
চিত্র : এক সারিবিশিষ্ট গোয়ালঘর
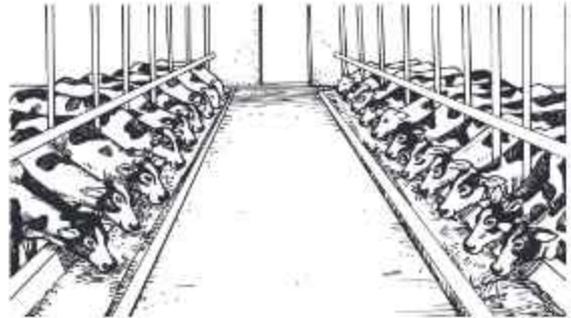
চিত্র : দুই সারি বিশিষ্ট গোয়ালঘর

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে আদর্শ গোয়াল ঘর কেন প্রয়োজন-এ বিষয়ে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : নিবিড় যত্ন।

পাঠ ১৬ : গরুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

গরু জাবরকাটা প্রাণী হওয়ায় বেশি পরিমাণ আঁশ জাতীয় খাদ্য খেয়ে থাকে। এদের খাদ্য হিসেবে সবুজ ঘাস, খড় ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয়। দেশি গরু কম দুধ উৎপাদন করায় অনেকে কোনো দানাদার খাদ্য সরবরাহ করে না। কিন্তু উন্নত জাতের সংকর গাভী বেশি দুধ উৎপাদন করায় সবুজ ঘাস ও খড়ের সাথে অবশ্যই পরিমিত দানাদার খাবার সরবরাহ করা হয়।

সবুজ ঘাস : সবুজ ঘাসই গাভীর প্রধান খাদ্য। কিন্তু এদেশে চারণভূমি ও খোলা সবুজ মাঠ না থাকায় পশুর সবুজ ঘাসের অভাব লেগেই থাকে। তাই বাড়ির পাশের পতিত জমি, পুকুরপাড়, রাস্তা, রেললাইন ও বাঁধের ধারে উন্নত জাতের ঘাস চাষ করতে হবে। উন্নত জাতের ঘাস হিসেবে নেপিয়ার, পারা, জার্মান, গিনি এবং দেশি ঘাস চাষ করা যেতে পারে। তাছাড়া গরুকে সবুজ ঘাসের পরিবর্তে সুবিধামতো কোনো গাছের পাতা যেমন- ইপিল-ইপিল, আম পাতা, কলা পাতা, কাঁঠাল পাতা, কচুরিপানা ইত্যাদি খাওয়ানো যায়। রান্নাঘরের বিভিন্ন তরিতরকারি ও ফলের খোসা ফেলে না দিয়ে পশুকে সরবরাহ করা যেতে পারে। উন্নত ও সংকর জাতের গাভীর ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩-৪ কেজি সবুজ ঘাস সরবরাহ করতে হবে। তাই ওজনভেদে একটি গরুকে দৈনিক ১২-১৫ কেজি সবুজ ঘাস সরবরাহ করতে হয়।

খড় : আমাদের দেশে শুধু সবুজ ঘাস দিয়ে গরু পালন করা যায় না। তাই ঘাসের সাথে ধানের খড় সরবরাহ করতে হবে। উন্নত ও সংকর জাতের গাভীর ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১ কেজি খড় সরবরাহ করতে হবে। তাই ওজনভেদে একটি গরুকে দৈনিক ৩-৫ কেজি খড় সরবরাহ করতে হয়। ধানের খড়কে কেটে পানিতে ভিজিয়ে নরম করলে পশুর জন্য খেতে ও হজম করতে সুবিধা হয়। খড়কে এককভাবে না দিয়ে খড়ের সাথে খৈল, ভুসি, ভাতের মাড় ও ২০০-৩০০ গ্রাম ঝোলা গুড় মিশিয়ে খাওয়ালে গরুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে ও দুধ উৎপাদন বেড়ে যায়।

দানাদার খাদ্য : গবাদিপশুর জন্য বিভিন্ন দানাশস্য ও এদের উপজাতসমূহকে দানাদার খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গাভীকে দৈনিক যে পরিমাণ দানাদার খাদ্য দিতে হয় তা দুই ভাগ করে সকালে ও বিকালে দুধ দোহনের আগে সরবরাহ করতে হবে। উন্নত ও সংকর গাভীর ক্ষেত্রে প্রথম ৩ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য ২ কেজি দানাদার এবং পরবর্তী প্রতি ৩ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য আরও ১ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

কাজ : একটি জার্সি গাভী দৈনিক ১২ লিটার দুধ দিলে তাকে কী পরিমাণ দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে- এককভাবে তা হিসেব করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

গাভীর দানাদার খাদ্যতালিকা নিচে দেওয়া হলো-

দানাদার খাদ্য	পরিমাণ %
গমের ভুসি	৪০
চালের কুঁড়া	২০
ভুট্টার গুঁড়া	২০
সরিষার খৈল	২০
মোট	১০০%

খনিজ লবণ : একটি দুধেল গাভীকে দৈনিক ১০০-১২০ গ্রাম লবণ ও ৫০-৬০ গ্রাম হাড়ের গুঁড়া সরবরাহ করতে হবে।

পানি : একটি উন্নত জাতের গাভী দৈনিক ৪০ লিটার পানি পান করতে পারে। তাই পশুকে প্রতিদিন পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।

পাঠ ১৭ : গরুর বিভিন্ন প্রকার রোগ

গরু আমাদের অনেক উপকারে আসে। কিন্তু এসব পশু মানুষের মতো বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পশুর দুধ, মাংস এবং কর্মক্ষমতা কমে যায়। অনেক পশু যত্ন ও চিকিৎসার অভাবে মারাও যায়। তাই পশু পালনকারীর রোগ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত। এ পাঠে গরুর রোগ ও রোগ পরিচিতি বর্ণনা করা হলো-

রোগ : পশুর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের বিচ্যুতিকে রোগ বলা হয়। রোগাক্রান্ত পশুর খাদ্যগ্রহণ কমে যাবে। পশু ঝিমাতে থাকবে। প্রশ্রাব ও পায়খানায় সমস্যা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এদের শরীরের লোম খাড়া দেখায় ও তাপ বেড়ে যায়। গবাদিপশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এদের রোগসমূহকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

ক। সংক্রামক রোগ

খ। পরজীবীজনিত রোগ

গ। অপুষ্টিজনিত রোগ ও

ঘ। অন্যান্য সাধারণ রোগ
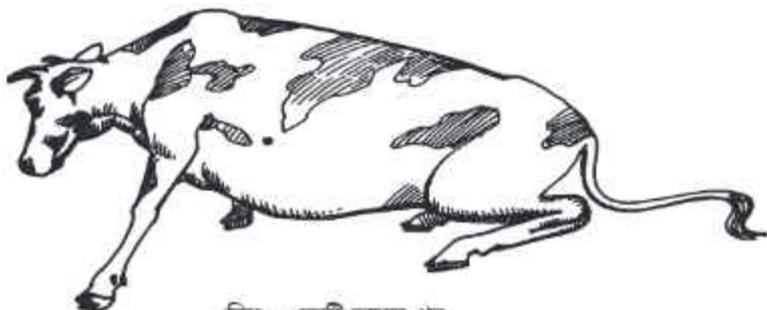
চিত্র : একটি অসুস্থ গরু

ক। সংক্রামক রোগ : যে সকল রোগ রোগাক্রান্ত পশু হতে সুস্থ পশুর দেহে সংক্রমিত হয় তাকে সংক্রামক রোগ বলে। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার কারণে পশুতে এ সকল রোগ হয়ে থাকে। উল্লিখিত রোগের মধ্যে সংক্রামক রোগই সবচেয়ে বেশি মারাত্মক। সংক্রামক রোগের মধ্যে আবার ভাইরাসজনিত রোগ পশুর বেশি ক্ষতি করে থাকে, যেমন- খুরা-রোগ, জলাতঙ্ক, গোবসন্ত ইত্যাদি। ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগের মধ্যে গবাদিপশুতে বাদলা, তড়কা, গলাফোলা, ওলান-ফোলা, বাছুরের নিউমোনিয়া ও ডিপথেরিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নিম্নে কয়েকটি রোগের কারণ ও লক্ষণ দেওয়া হলো :

খুরা রোগ : সকল জোড়া খুর বিশিষ্ট গবাদি পশু এ রোগে আক্রান্ত হয়। এটি একটি ভাইরাস জনিত সংক্রামক রোগ। লালা, খাদ্য দ্রব্য ও বাতাসের মাধ্যমে সুস্থ প্রাণীরা সংক্রমিত হয়।

রোগের লক্ষণ : পশুর খুরায়, মুখে ও জিহ্বায় ফোস্কার মতো দেখা যায়। পরে ফোস্কা থেকে ঘা হয় এবং মুখ হতে লালা ঝরে। তাপমাত্রা বাড়ে ও খাবারে অরুচি হয়। ধীরে ধীরে পশু দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেক সময় পশু মারা যায়। কম বয়স্ক পশু বা বাছুরের মৃত্যুর হার বেশি।

বাদলা : গবাদি পশুর ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত এই রোগ হতে দেখা যায়। এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক ব্যাধি। ক্ষতস্থান ও মলের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।

রোগের লক্ষণ : বাদলা রোগে আক্রান্ত হলে পশুর নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো দেখা যায়-

- আক্রান্ত পশু খুঁড়িয়ে হাটে।
- শরীরের বিভিন্ন স্থান ফুলে যায় ও ব্যাথা অনুভব করে।
- ফোলা স্থানে পচন ধরে ও কয়েক ঘন্টার মধ্যে আক্রান্ত পশু মারা যায়।
- আক্রান্ত স্থানে চাপ দিলে পচ পচ শব্দ হয়।
- শরীরের তাপমাত্রা (১০৪°-১০৫° ফা.) বেড়ে যায়।

তড়কা : তড়কা একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক ব্যাধি।

রোগের লক্ষণ : নিচে তড়কা রোগের লক্ষণ উল্লেখ করা হলো :

- তড়কা রোগ হলে পশু মাটিতে পড়ে যায়।
- শরীরের তাপমাত্রা (১০৪°-১০৫° ফা.) ও গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়।
- মৃত পশুর নাক, মুখ ও পায়ুপথ দিয়ে রক্ত নির্গত হয়।

খ। পরজীবীজনিত রোগ : যেসব ক্ষুদ্র প্রাণী বড়ো প্রাণীর দেহে আশ্রয় নেয় তাদেরকে পরজীবী বলে। এরা আশ্রয়দাতার দেহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে বেঁচে থাকে ও বংশবিস্তার করে। পরজীবীকে দুইভাগে ভাগ করা হয়, যথা-

১) বহিঃপরজীবী– উকুন, মশা, মাছি, আটালি, মাইট ইত্যাদি পশুর চামড়ার উপর বাস করে এবং দেহ হতে রক্ত শোষণ করে পশুর ক্ষতি করে থাকে।

২) দেহাভ্যন্তরের পরজীবী : এরা পশুর দেহের ভেতর বাস করে, যা কৃমি নামে পরিচিত। কৃমি দেখতে পাতা, ফিতা ও গোল বলে এদেরকে পাতা কৃমি, ফিতা কৃমি ও গোল কৃমি বলা হয়। এরা আশ্রয়দাতার দেহের ভিতর হতে পুষ্টি গ্রহণ করে পশুকে রোগাক্রান্ত করে তোলে।

গ। অপুষ্টিজনিত রোগ : আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, পানি ইত্যাদি যে কোনো একটি পুষ্টি উপাদানের অভাবে গবাদিপশুর রোগ হলে তাকে অপুষ্টিজনিত রোগ বলা হয়। মানুষ ও গবাদিপশুর শরীরে খাদ্যের অন্যান্য উপাদানের তুলনায় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ খুবই কম পরিমাণে দরকার হয়। প্রধানত এ দুটি পুষ্টি উপাদানের অভাবে পশু অপুষ্টিজনিত রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। যেমন- দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, দৈহিক বৃদ্ধি না হওয়া, ত্বক অমসৃণ হওয়া, দেরিতে দাঁত উঠা, হাড় বেঁকে যাওয়া, দুধ জ্বর (milk fever) ইত্যাদি।

ঘ। অন্যান্য সাধারণ রোগ : অন্যান্য সাধারণ রোগের মধ্যে পেট ফাঁপা, উদরাময় ও বদহজম উল্লেখযোগ্য। সাধারণত খাদ্যে অনিয়ম, পচা-বাসি খাদ্য ও দূষিত পানির কারণে এ ধরনের রোগ হয়ে থাকে। বাছুরকে খাদ্য সরবরাহের সময় এ বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে গরুর রোগের বিভিন্ন কারণ লিপিবদ্ধ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : সংক্রামক রোগ, পাতা কৃমি, ফিতা কৃমি ও গোল কৃমি।

পাঠ ১৮ : গরুর রোগ ব্যবস্থাপনা

গবাদিপশুর খামারে রোগ ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পশুর রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রোগ ব্যবস্থাপনা করা হয়। পশু খামারে রোগ না হওয়ার জন্য গৃহীত উপায়সমূহকে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বলা হয়। খামারে রোগ দেখা দেওয়ার পর চিকিৎসাসহ অন্যান্য গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

পশুর রোগ প্রতিরোধের উপায়সমূহ : পশুর স্বাস্থ্য ও উৎপাদন ঠিক রাখার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পালন ব্যবস্থার বিকল্প নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি প্রবাদ হচ্ছে "রোগব্যাধির চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধই শ্রেয়"। তাই পশু খামারের উৎপাদন চলমান রাখার জন্য পশুর রোগ প্রতিরোধের

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে। নিম্নে পশু খামারে রোগ প্রতিরোধের উপায়সমূহ বর্ণনা করা হলো—

১। গোয়ালঘর ও এর চারপাশ নিয়মিত পরিষ্কার ও শুকনো রাখা।

২। কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য বন্য পশুকে খামারে ঢুকতে না দেওয়া।

৩। খামারে সাধারণ মানুষের প্রবেশ বন্ধ করা।

৪। পশুকে নিয়মিত টিকা দেওয়া।

৫। পশুকে সময়মতো কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো।

৬। পশুকে সুষম খাবার সরবরাহ করতে হবে।

৭। খাদ্যের পাত্র ও পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করা।

৮। পশুকে তাজা খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।

৯। সম্ভব হলে বিভিন্ন বয়সের গরুকে আলাদা রাখা।

১০।পশুকে অতি গরম ও ঠান্ডা হতে রক্ষার ব্যবস্থা করা।

কাজ : শিক্ষক ভিডিয়োর মাধ্যমে পশু খামারে রোগ প্রতিরোধের উপায়সমূহ দেখাবেন এবং দলীয় বা একক কাজ দেবেন।

গবাদিপশুর রোগ হলে করণীয় : পশুতে রোগ দেখা দিলে আতঙ্কিত না হয়ে রোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ সময় নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করতে হবে—

১। রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে অসুস্থ পশুকে সুস্থ পশুর দল থেকে আলাদা করা।

২। অসুস্থ পশুকে চিকিৎসা প্রদান করা।

৩। অসুস্থ পশুকে আলাদা ঘরে পর্যবেক্ষণ করা।

৪। প্রয়োজনে অসুস্থ পশুর রক্ত ও মলমূত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

৫। রোগাক্রান্ত পশুকে বাজারজাত না করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে গরুর রোগ প্রতিরোধের সহায়ক কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে সম্পর্কে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : সংক্রামক রোগ, পাতা কৃমি, ফিতা কৃমি ও গোল কৃমি।

পাঠ ১৯ : ডিম সংগ্রহ ও বাছাই

ডিম একটি ভঙ্গুর ও পচনশীল দ্রব্য। বাড়িতে বা খামারে দুইধরনের ডিম উৎপাদন করা হয়। বাচ্চা ফুটানোর জন্য যে ডিম উৎপাদন করা হয় তাকে বীজ ডিম এবং খাবার জন্য যে ডিম উৎপাদন করা হয় তাকে খাবার ডিম বলা হয়। বীজ ডিম উৎপাদনের জন্য মোরগের দরকার হয় কিন্তু খাবার ডিম উৎপাদনের জন্য মোরগের দরকার হয় না।

ডিম সংগ্রহ : ডিম পাড়ার পর দ্রুত সংগ্রহ, বাছাই ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খাঁচায় ডিম পাড়া মুরগি নিজের ডিম নষ্ট করতে পারে না এবং ডিমগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। অন্যদিকে মেঝেতে বা লিটারে পালনকারী অনেক মুরগি বাসায় ডিম না পেড়ে লিটারে পাড়ে। অনেক সময় এটি তার অভ্যাসে পরিণত হয়। লিটারে পাড়া ডিমে ময়লা লেগে যায় এবং পরিষ্কার করতে অসুবিধা হয়। তা ছাড়া লিটারে ডিম পাড়ার সময় পাতলা খোসার ডিম অনেক সময় ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। লিটারে ডিম পাড়ার আরেকটা সমস্যা হচ্ছে মুরগির ডিম খাওয়া। এটি একবার সৃষ্টি হলে তা বদঅভ্যাসে রূপ নেয়। মুরগির ডিম দিনে ২ বার সংগ্রহ করতে হবে। দুপুর ১২.০০ ঘটিকা ও বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় ডিম সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু হাঁসের ডিম মাত্র একবার সংগ্রহ করা হয়। কারণ হাঁস সকাল ৯.০০ ঘটিকার মধ্যে ডিম পাড়ে।
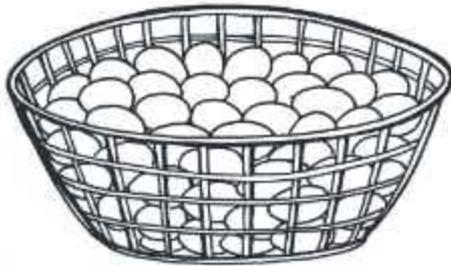
চিত্র : ঝুড়িতে সংগ্রহ করা ডিম
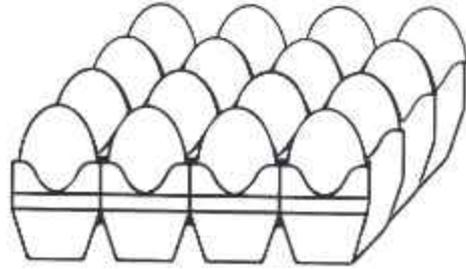
চিত্র : ট্রেতে বাছাই করা ডিম

ডিম বাছাই : ডিম সংগ্রহ করার পর তা বাছাই করা হয়। বীজ ডিমের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ডিম যেমন- অতিবড়ো অতিছোটো, গোলাকৃতি ও লম্বা আকারের ডিম বাদ দিতে হবে। তা ছাড়া অধিক ময়লাযুক্ত ডিম, ফাটা ও পাতলা খোসার ডিম ফুটানোর জন্য নির্বাচন করা হয় না। কোনো খাবার ডিম বেশি ময়লাযুক্ত হলে পানি দিয়ে ধোয়া যায়। খাবার ডিম বা বীজ ডিম বাছাই করার পর প্লাস্টিক ট্রেতে সাজাতে হবে। ট্রেতে ডিম বসানোর সময় ডিমের মোটা অংশ উপরের দিকে ও সরু অংশ নিচের দিকে দিতে হবে। এরপর ট্রে-সহ ডিমকে ঠান্ডা স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। বীজ ডিম দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ৫০-৫৫° ফারেনহাইট (১০-১২° সে.) তাপমাত্রায় অর্থাৎ ঠান্ডা স্থানে সংরক্ষণ করতে হয়। খাবার ডিম মাটির হাঁড়িতে বা ডিমে তেল মাখিয়ে অনেক দিন রাখা যায়। কিন্তু বীজ ডিম গরমকালে ৩-৫ দিন ও শীতকালে ৭ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়।

কাজ : শিক্ষক ডিম সংগ্রহ ও বাছাইয়ের উপর ভিডিয়ো দেখাবেন কিংবা ডিম সরবরাহ করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের ভালো ডিমের বৈশিষ্ট্য লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলবেন।

বাছাইয়ের সময় গ্রেডিং করা : আমাদের দেশে হালি বা ডজন হিসেবে ডিম বিক্রি হয়। বাজারে ওজন হিসেবে ডিম বিক্রি হয় না। বড় ডিমে বেশি পুষ্টি পাওয়া যায়। তাই ওজন অনুসারেই ডিম বিক্রি হওয়া উচিত। ডিম বাছাইয়ের সময় আকারে বা ওজন অনুসারে ডিমকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে --

ডিমের গ্রেডিং তালিকা (মুরগি)

ক্রমিক নং	আকার	একটি ডিমের ওজন (গ্রাম)
১	অতিবড়ো	৬০ গ্রামের অধিক
২	বড়ো	৫৩-৫৯ গ্রাম
৩	মাঝারি	৪৬-৫২ গ্রাম
৪	ছোটো	৩৮-৪৪ গ্রাম

নতুন শব্দ : বীজ ডিম, খাবার ডিম, লিটার।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গাভীর প্রধান খাদ্য কোনটি?

ক. খড় খ. কাঁচাঘাস

গ. দানাদার খাদ্য ঘ. লতাপাতা

২. মাশরুমের চাষঘরে পানি স্প্রে করার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়-

i. আর্দ্রতা

ii. তাপমাত্রা

iii. কার্বন ডাই-অক্সাইড

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৩. ফল সংগ্রহ করার পরই শর্করা থেকে চিনি তৈরি বন্ধ হয়ে যায় কোন ফলগুচ্ছে?

ক. কলা, লেবু, লিচু খ. বেল, কলা, আঙুর

গ. পেঁপে, আঙুর, জাম্বুরা ঘ. আঙুর, লিচু, লেবু

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

হাফিজ সাহেব বাড়ির সামনের ৪০ শতক আয়তনের ১ মিটার গভীরতার ১টি পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ করেন। কিন্তু তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও পুকুর থেকে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাননি।

৪. হাফিজ সাহেব তার পুকুরে কমপক্ষে ৭-১০ সে. মি. আকারের কতটি পোনা ছাড়তে পারবেন?

ক. ২০০০ খ. ২১০০

গ. ২২০০ ঘ. ২৩০০

৫. হাফিজ সাহেবের পুকুর থেকে কাঙ্খিত উৎপাদন না পাওয়ার কারণ-

i. প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন কম হওয়া

ii. পানির গুণাগুণ যথাযথ না থাকা

iii. পুকুরের আয়তন বেশি হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. মাশরুম চাষের জন্য প্যাকেটজাত বীজকে কী বলা হয়?

ক. স্পন খ. স্পট

গ. মিল্কি ঘ. বাটন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.
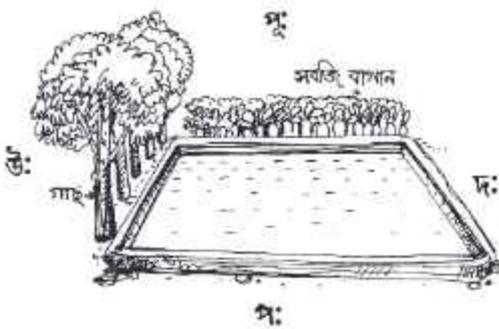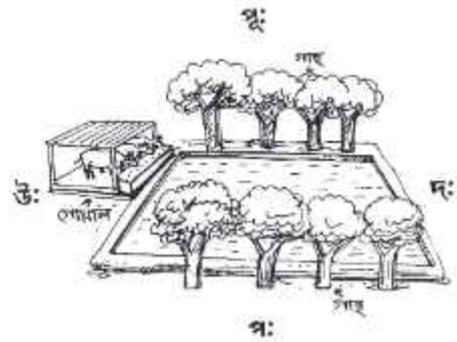
চিত্র : ১ চিত্র : ২

ক. মিশ্র চাষ কাকে বলে?

খ. মাছের মিশ্র চাষের একটি সুবিধা ব্যাখ্যা কর।

গ. চিত্রের কোন পুকুরটি মিশ্র চাষের জন্য উপযোগী ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রের পুকুর দু টিমাছ চাষে সমানভাবে লাভজনক কি না- উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. আলম যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৫টি সংকর জাতের গাভী দিয়ে একটি খামার গড়ে তোলেন। তিনি গাভীগুলোর যত্ন ও পরিচর্যা করার পরও প্রতিটি গাভী থেকে আশানুরূপ দুধ পাচ্ছিলেন না। এ অবস্থায় পশু পালন কর্মকর্তার পরামর্শ মতে স্বাস্থ্যসম্মত পালন ব্যবস্থা গ্রহণ করায় প্রতিটি গাভী ১২ লিটার করে দুধ দেয়। বর্তমানে তিনি একজন সফল খামার মালিক।

ক. গরু কোন জাতের খাদ্য বেশি পরিমাণ খায়?

খ. গোয়ালঘর উঁচু স্থানে করা প্রয়োজন কেন, ব্যাখ্যা কর।

গ. আলমের খামারের ১টি গাভীর জন্য দৈনিক কী পরিমাণ দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন তা নির্ণয় কর।

ঘ. আলম কী ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তার গাভীগুলোর দুধ উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌছায়, বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বনায়ন

কৃষি বনায়ন একটি অতি প্রাচীন ও সনাতন পদ্ধতি। সাম্প্রতিককালে বনায়নের এ পদ্ধতি কৃষিপ্রযুক্তি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। কৃষি বনায়ন হলো কৃষিজ ও বনজ বৃক্ষের সম্মিলিত চাষাবাদ পদ্ধতি, যাতে একজন কৃষক ভূমির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর উৎপাদন ও মুনাফা অর্জন করতে পারেন। এ বনায়ন পদ্ধতি পরিবেশবান্ধবও বটে। সারাদেশে পরিকল্পিত উপায়ে বনজ সম্পদ বৃদ্ধি করা খুবই জরুরি। এ জন্য কৃষি ও সামাজিক বনায়ন সম্পর্কে আমাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। এ বনায়নের গুরুত্বও আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। সরাসরি এসব বনায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে দেশের বনজ সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবেশ বাস উপযোগী রাখতে হবে। এ অধ্যায়ে তোমরা নার্সারিতে চারা তৈরির কৌশল ও এর অবদান সম্পর্কে জানবে ও দক্ষতা অর্জন করবে। এছাড়া কৃষি ও সামাজিক বনায়নের গুরুত্ব, সমস্যা এবং সমাধানের উপায় নির্ধারণ করতে পারবে। সামাজিক ও কৃষি বনায়নের নকশা তৈরি করতে পারবে। সড়ক ও বাঁধের ধারে বৃক্ষরোপণ করতে পারবে।
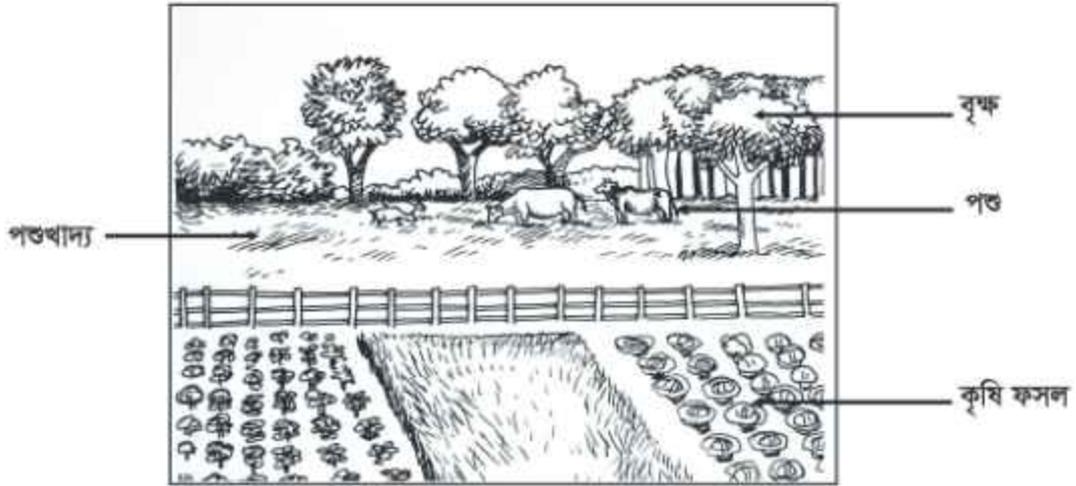
চিত্র : কৃষি বনায়ন

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- নার্সারি তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পলিব্যাগে চারা তৈরি করতে পারব।
- কৃষি বনায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি বনায়নের সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।

- সামাজিক ও কৃষি বনায়নের নকশা বর্ণনা করতে পারব ।
- সামাজিক ও কৃষি বনায়নের নকশা প্রস্তুত করতে পারব ।
- মিশ্রবৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- সড়ক ও বাঁধের ধারে বৃক্ষরোপণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব ।

পাঠ ১ : নার্সারি

নার্সারি হলো চারা উৎপাদন কেন্দ্র যেখানে চারা উৎপাদন করে রোপণের পূর্ব পর্যন্ত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় । নার্সারি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনের দরকার । এ জন্য সুবিধামতো সময়ে শিক্ষকের সাথে নার্সারি পরিদর্শন করবে । শ্রেণিতে নার্সারির ভিডিয়ো চিত্র দেখবে । সম্ভব না হলে চার্টে নার্সারির চিত্র পর্যবেক্ষণ করবে । নার্সারি সম্পর্কে শিক্ষক যেসব প্রশ্ন করেন তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে ।

চিত্র : স্থায়ী নার্সারি

আমাদের দেশে অধিক জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে বনজ সম্পদ আজ ধ্বংসের মুখোমুখি । এর ফলে আমাদের পরিবেশ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে । এ অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বনায়ন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ করা দরকার। আর যেকোনো বনায়নে প্রয়োজন সবল চারা। এ জন্য আমাদের নার্সারির উপর নির্ভর করতে হয় ।

নার্সারির প্রকারভেদ

১ । স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে নার্সারি দুই ধরনের হয়, যথা-

(ক) স্থায়ী নার্সারি (খ) অস্থায়ী নার্সারি

(ক) স্থায়ী নার্সারি : এ ধরনের নার্সারিতে বছরের পর বছর চারা উৎপাদন করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকে। আমাদের দেশে সরকারি, বেসরকারি উভয় ব্যবস্থায় স্থায়ী নার্সারি রয়েছে। এখান থেকে উন্নত মানের চারা সরবরাহ করা হয়।

(খ) অস্থায়ী নার্সারি : সড়ক ও জনপথ বিভাগ নতুন রাস্তা নির্মাণের পর রাস্তার দুইপাশে গাছ লাগায়। এ জন্য অস্থায়ী নার্সারি স্থাপন করে। যেখানে এ রকম বাগান তৈরি করা হয় বা ব্যাপক হারে বনায়ন করা হয়, সেখানে অস্থায়ী ভিত্তিতে নার্সারি স্থাপন করা হয়। এতে চারা পরিবহনে খরচ কম হয়। সতেজ চারা সহজে পাওয়া যায়।

২। মাধ্যমের উপর নির্ভর করে নার্সারিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়-

(ক) পলিব্যাগ নার্সারি : এ ক্ষেত্রে চারা পলিব্যাগে উৎপাদন ও পরিচর্যা করা হয়। পলিব্যাগ সহজে নিরাপদ জায়গায় নেওয়া যায়। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে চারা রক্ষা করা যায়।

(খ) বেড নার্সারি : এ ক্ষেত্রে সরাসরি মাটিতে বেড করে চারা উৎপাদন করা হয়। অনেক সময় বেডে উৎপাদিত চারা উত্তোলন করে পলিব্যাগে স্থানান্তর করা হয়। এছাড়া রয়েছে- গার্হস্থ্য নার্সারি, প্রজাতিভিত্তিক নার্সারি ও ব্যবহারভিত্তিক নার্সারি।

কাজ-১ : নার্সারি সম্পর্কীয় নিচের ম্যাপ দুটি পোস্টার পেপারে দলগতভাবে সম্পন্ন কর।

কৃষিক্ষেত্রে নার্সারির প্রয়োজনীয়তা

- রোপণের জন্য সব সময় নার্সারিতে সুস্থ, সবল ও সব বয়সের চারা পাওয়া যায়।
- নার্সারিতে সহজে চারার যত্ন নেওয়া যায়।
- গর্জন, শাল, তেলসুর প্রভৃতি গাছের বীজ গাছ থেকে ঝরার ২৪ ঘন্টার মধ্যে রোপণ করতে হয়। এসব উদ্ভিদের চারা তৈরির জন্য নার্সারিই উত্তম স্থান।

- কাঁঠাল, চম্পা প্রভৃতি গাছের বীজ ফল থেকে বের করার পরই রোপণ না করলে অঙ্কুরোদগমের হার কমে যায়। এসব গাছের চারা তৈরির জন্য নার্সারির প্রয়োজন।
- অল্প শ্রমে ও কম খরচে চারা তৈরির জন্য নার্সারি উপযুক্ত স্থান।
- চারা বিতরণ ও বিপণন করতে সুবিধা হয়।

কাজ-২ : দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নার্সারির গুরুত্ব তালিকা আকারে লিখ।

পাঠ ২ : নার্সারি তৈরির কৌশল

নার্সারি তৈরি করতে হলে প্রথমেই যা দরকার তা হলো সুষ্ঠু পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা নির্দিষ্ট কিছু নীতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে করতে হয়। স্থায়ী নার্সারি স্থাপনকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে :

১. স্থান নির্বাচন
২. নার্সারি জায়গার পরিমাণ নির্ণয়
৩. বেড়া নির্মাণ
৪. ভূমি উন্নয়ন
৫. অফিস ও বাসস্থান
৬. বিদ্যুতায়ন
৭. রাস্তা ও পথ
৮. সেচব্যবস্থা
৯. নর্দমা ও পার্শ্বনালা
১০. নার্সারি ব্লক
১১. নার্সারি বেড
১২. পরিদর্শন পথ

নার্সারির স্থান নির্বাচন

নির্বাচিত জমি উর্বর ও দোআঁশ মাটিসম্পন্ন হতে হবে। অপেক্ষাকৃত উঁচু, সমতল ও আলো বাতাস সম্পূর্ণ হতে হবে। পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকবে। মালামাল ও চারা পরিবহনে উন্নত ব্যবস্থা থাকবে।

এক বর্গমিটার (১০.৭৫ বর্গফুট) নার্সারীর বীজতলায় বেডে নিম্নলিখিত সংখ্যক চারার সংস্থান হবে-
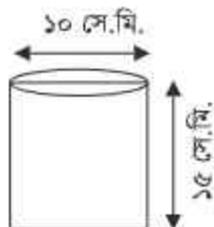
১০ সে.মি.
১৫ সে.মি.

চিত্র : পলিব্যাগ

পলিব্যাগের সাইজ	প্রতি পলিব্যাগে চারার সংখ্যা
১৫ সে.মি. X ১০ সে.মি.	৬৫টি
১৮ সে.মি. X ১২ সে.মি.	৪৫টি
২৫ সে.মি. X ১৫ সে.মি.	২৬টি

বীজতলার হতে চারার দূরত্ব	প্রতি বর্গমিটারে চারার সংখ্যা
৫ X ১০ সে.মি.	৪০০টি
১০ X ১২ সে.মি.	২০০টি
১০ X ১০ সে.মি.	১০০টি

নার্সারি ব্লক, বেড ও পরিদর্শন পথ

যেখানে চারা উৎপাদন করা হবে নার্সারির সে অংশকে কয়েকটি ব্লকে ভাগ কর। প্রত্যেক ব্লকে ১০-১২টি লম্বালম্বি বেড রাখো। দুই বেডের মধ্যে ২৫ সে.মি. দূরত্ব রাখো। বিভিন্ন ব্লকের মধ্যে সুবিধামতো পরিদর্শন পথ ও পার্শ্বপরিদর্শন পথ রাখ। প্রধান পরিদর্শন পথ ২-৩ মি. এবং পার্শ্ব পরিদর্শন পথ ১-২ মি. প্রস্থ হবে। নার্সারিতে প্রধান পরিদর্শন পথ দিয়ে যাতে সহজে গাড়ি চলাচল করতে পারে এমনভাবে তৈরি করতে হবে। পার্শ্ব পরিদর্শন পথে যাতে সহজে চারা পরিবহন ট্রলি চলাচল করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
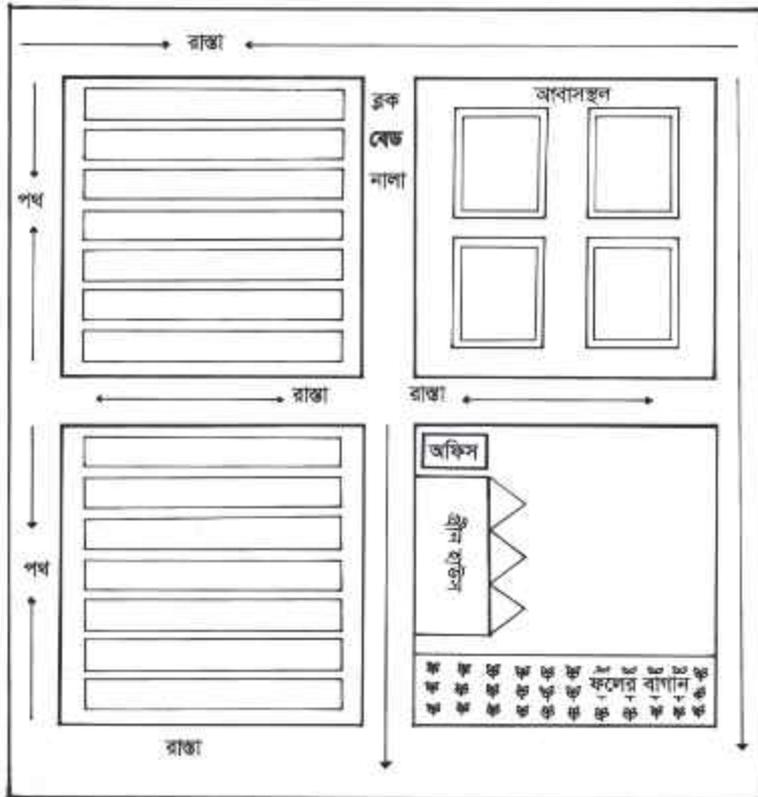
চিত্র : নার্সারির পরিকল্পনা (নমুনা)

কাজ-১ : দলগতভাবে একটি স্থায়ী নার্সারি পরিকল্পনা পোস্টার পেপারে আঁক এবং উপস্থাপন কর।

পাঠ ৩ : পলিব্যাগে চারা তৈরি করা

হাতে কলমে পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা তৈরির জন্য শ্রেণি সংগঠন ও নির্দেশাবলি

১. সুবিধামতো দলে ভাগ হয়ে প্রত্যেক দলের দলনেতা নির্বাচন কর।

২. প্রত্যেক দলের দলনেতা পলিব্যাগে চারা তৈরিসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ বুঝে নাও।

৩. প্রত্যেক দল কাজের ধাপ অনুসরণ করে পলিব্যাগ তৈরি কর।

৪. এবার পলিব্যাগে বীজ বপন করে পর্যবেক্ষণ কর।

৫. পলিব্যাগে চারা তৈরিসংক্রান্ত দলীয় প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ শিক্ষকের কাছে জেনে নাও।

৬. পাঠের এ অংশ মাঠে সম্পন্ন কর।

বিষয় : পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা তৈরি।

উপকরণ : বীজ, দোআঁশ মাটি, গোবর, কম্পোস্ট, ১৫ সে.মি. X ১০ সে.মি. আকারের পলিব্যাগ, পানি দেওয়ার ঝাঁঝর।

কাজের ধাপ :

১. মাটি ভেঙে গুঁড়া করে নাও।

২. ৪ ভাগের ৩ ভাগ মাটি ও ১ ভাগ গোবর বা কম্পোস্ট সার ভালো করে মেশাও।

৩. পলিব্যাগের তলাসহ দুই সারিতে ৮টি ছিদ্র কর।

৪. পলিব্যাগে ভালো করে মাটি ভর্তি কর।

৫. ছায়াযুক্ত সমতল জায়গায় সারিবদ্ধভাবে পলিব্যাগগুলো সাজাও।

৬. মাটিভর্তি পলিব্যাগের উপরে আঙুল দিয়ে দুইটি গর্ত করো। প্রতিটি গর্তে একটি করে বীজ দাও।

৭. গুঁড়ামাটি দিয়ে বীজ ভালো করে ঢেকে দাও। ঝাঁঝর দিয়ে হালকাভাবে পানি ছিটিয়ে দাও।

৮. বীজ বপনের তারিখ খাতায় লিখে রাখ।

৯. প্রতিদিন সকাল-বিকাল ঝাঁঝর দিয়ে পরিমিত পরিমাণ পানি দাও।

১০. অঙ্কুরোদগম শুরুর তারিখ খাতায় লিখে রাখ।

১১. চারার উচ্চতা ১৫ সে.মি. হওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ কর।

১২. পরীক্ষার সব তথ্য খাতায় লিখে রাখ। প্রতিবেদন তৈরি করে দলীয়ভাবে শিক্ষকের নিকট জমা দাও।

পলিব্যাগে চারা তৈরি সংক্রান্ত চিত্র

চিত্র : পলিব্যাগের জন্য মাটির গুঁড়া চালনি দিয়ে চেলে নেওয়া

চিত্র : পলিব্যাগে মাটিভর্তি

চিত্র : পলিব্যাগে বীজ রোপণ
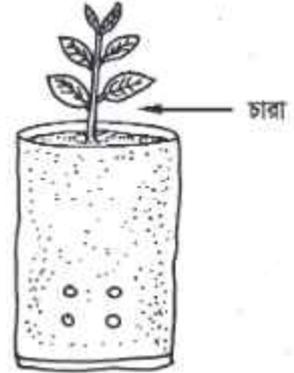
চিত্র : পলিব্যাগে চারা রোপণ

চিত্র : নার্সারি বেডে পলিব্যাগে সাজানো পদ্ধতি
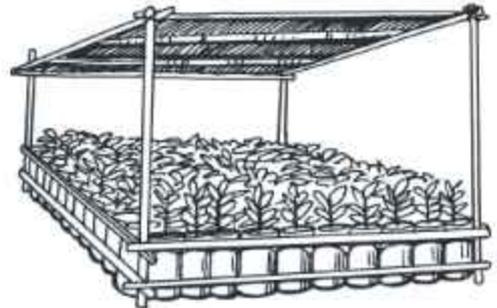
চিত্র : নার্সারি বেডে পলিব্যাগে বাঁশের ছাউনি

কাজ : পলিব্যাগে চারা তৈরিসংক্রান্ত চিত্রগুলো সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ কর এবং পলিব্যাগে মাটি ভর্তি ও বীজ বপন পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

পাঠ ৪ : কৃষি বনায়নের গুরুত্ব

কৃষি বনায়ন হলো এক ধরনের ভূমি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সুপরিকল্পিতভাবে বনায়ন করা হয়। এ ধরনের বনায়নে একই জমিতে বৃক্ষ, ফসল, পশুখাদ্য ও মৎস্যখাদ্য উৎপাদন করা হয়। এ বনায়নে কোনো উপাদান অন্য উপাদানকে ব্যাহত করে না। সব উপাদান সমন্বিতভাবে পরিবেশ সমৃদ্ধ করে। অর্থনৈতিকভাবে এ বনায়ন লাভজনক হয়। এ বনায়নের ফলে ভূমির বহুমুখী ব্যবহার করা যায়।

কাজ

১। শিক্ষক কর্তৃক প্রদর্শিত চিত্র পর্যবেক্ষণ করে এটিকে কেন কৃষি বনায়ন বলা হয় তা দলে উপস্থাপন কর।

২। দলীয়ভাবে আলোচনা করে কৃষি বনায়ন কেন গুরুত্বপূর্ণ তা পোস্টার পেপারে লিখে দেখাও।
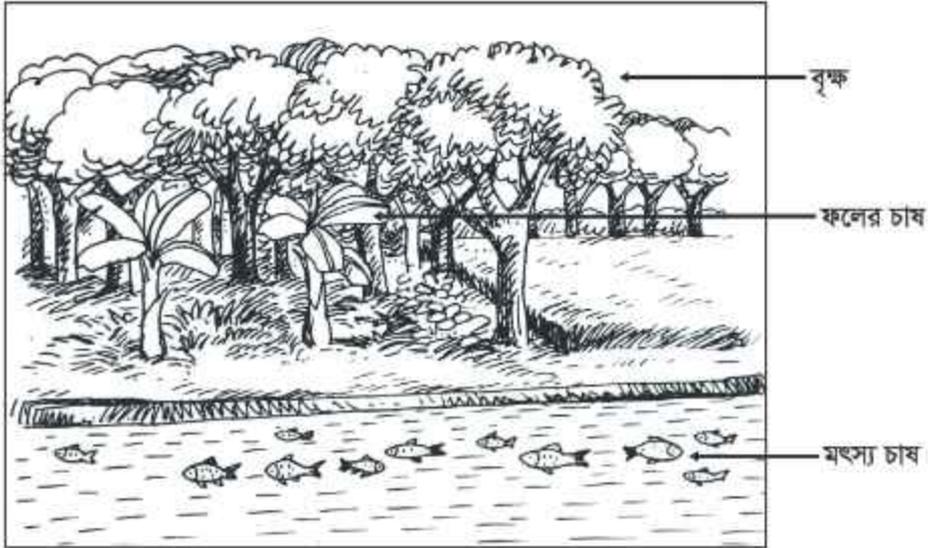
চিত্র : সমন্বিত মৎস্য, বৃক্ষ ও ফসল চাষের নমুনা

জনসংখ্যা সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আমাদের ভূমি সীমিত। বিশাল জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে এ ভূমি সক্ষম নয়। সুতরাং বৃক্ষায়ন শুধু বনভূমিতে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। কৃষি বনায়নকে আধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি। তাই সাধারণ কৃষি খামার, রাস্তা ও বাঁধের ধার, বাড়ির আঙিনা, প্রতিষ্ঠানের চারপাশ– সর্বত্র কৃষি বনায়ন জরুরি। এ জন্য সারাদেশে নিবিড় ও ব্যাপক কৃষি বনায়ন বিপ্লব ঘটানো প্রয়োজন।

কৃষি বনায়ন আমাদের জীবনের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ সম্পর্কে তোমাদের তৈরি তালিকার সাথে নিচের বিষয়গুলো মিলিয়ে দেখ ও আলোচনা কর—

কৃষি বনায়নের গুরুত্ব

১. খাদ্য চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে।

২. গৃহনির্মাণ ও আসবাবসামগ্রী তৈরিতে সাহায্য করে।

৩. জ্বালানি সমস্যা মেটায়।

৪. একই জমিতে বিভিন্ন রকম ফসল ও বৃক্ষ রোপণ করা যায়।

৫. অর্থ আয়ের ব্যবস্থা হয়, কর্মসংস্থান বাড়ে,ফলে দারিদ্র্য বিমোচন হয়।

৬. স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করা যায়।

৭. মাটিক্ষয় রোধ হয় ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

৮. পরিবেশ জীবের বসবাস উপযোগী হয়।

৯. প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১০. পশু পাখির খাদ্য ও আবাসস্থল সৃষ্টি হয়।

১১. বৃষ্টিপাত বেশি হয়।

১২. মরুকরণ, বন্যা ও ভূমিধ্বস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

মোট কথা, কৃষি বনায়ন গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

পাঠ ৫ : কৃষি বনায়নের সমস্যা ও সমাধান

কৃষি বনায়ন হলো একটি ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি, এর ফলে-

- একই জমিতে বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল উদ্ভিদের সাথে পশুপাখির সমন্বিত চাষ হয়।
- লতা জাতীয় ফসলকে একত্র করে মিশ্র চাষ করা হয়।
- কৃষি অথবা বনভিত্তিক একক ভূমি ব্যবহারের চেয়ে অধিকতর উৎপাদন ও উপকারিতা পাওয়া যায়।
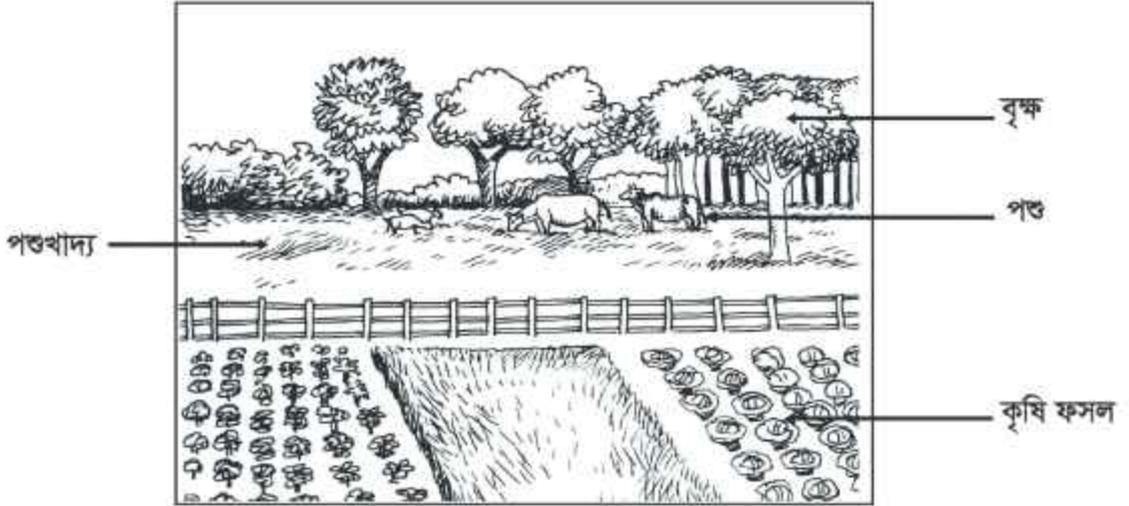
চিত্র : কৃষি বনায়ন

কৃষি বনায়নের সমস্যা

কৃষি বনায়ন সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী একটি লাভজনক প্রযুক্তি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। কিন্তু কৃষি বনায়নে যথেষ্ট সমস্যাও রয়েছে। এবার তোমরা কৃষি বনায়নের সমস্যা ও তা সমাধানের উপায় সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের মতামতের সাথে নিচের বিষয়গুলো মিলিয়ে দেখো-

- কৃষি বনায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ কমছে।
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে।
- পোকামাকড় ও ক্ষতিকর জীবজন্তুর আক্রমণে উৎপাদন কমছে।
- ভালো বীজ ও সারের অভাব।
- কৃষিবন রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা।
- শুকনো মৌসুমে পানি সেচের অভাব।
- উৎপাদিত দ্রব্য সংরক্ষণের অভাব।
- যাতায়াতে সুব্যবস্থা না থাকায় উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ করা যায় না। ফলে উৎপাদিত পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। অল্প মূল্যে কৃষককে পণ্য বিক্রয় করতে হয়।
- কৃষি বন সম্পর্কে কৃষকের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব।
- কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানা না থাকা।
- এলাকাভিত্তিক কৃষিপণ্য সংরক্ষণের অভাব।

কৃষি বনায়নের সমস্যাসমূহের সমাধান

কৃষি আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য যেসব জায়গায় সামাজিক বনায়ন করা হয় সেসব জায়গা কৃষি বনায়নের আওতায় আনা দরকার। শস্য পর্যায় অনুসরণ করে জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে যাতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। আলোর ফাঁদ, ফাঁদ যন্ত্র, নিম ও বিষ কাটালির নির্যাস ব্যবহার করে ক্ষতিকর জীবজন্তু ও পোকামাকড় দমন করতে হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা পুষিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কৃষক যাতে উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য পায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কৃষি বনায়ন সম্পর্কে কৃষককে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ নিতে হবে। ভালো বীজ ও সার সরকারিভাবে সরবরাহ করতে হবে। কৃষিবন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনগণের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করতে হবে। যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে যাতে কৃষক সহজে উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে সঠিক মূল্য পেতে পারে। এলাকাভিত্তিক কৃষি শিল্পকারখানা তৈরি করতে হবে যাতে করে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব হয়। তাছাড়া কৃষিপণ্য তাৎক্ষণিকভাবে সংরক্ষণের জন্য যথেষ্টসংখ্যক হিমাগারের ব্যবস্থাও সরকারি এবং বেসরকারিভাবে করা প্রয়োজন।

কাজ: কৃষি বনায়নের চিত্র ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর। নিজের মতো করে কৃষি বনায়ন সম্পর্কে বল। বাস্তবে তোমরা কৃষি বনায়ন দেখেছ কি? দেখে থাকলে এ বনায়নের বৈশিষ্ট্য বলো। কৃষি বনায়ন কেন লাভজনক? আমাদের দেশে কৃষি বনায়নের বাধা বা সমস্যাসমূহ কী কী তার তালিকা তৈরি কর। দলগত আলোচনার মাধ্যমে এসব সমস্যা দূর করার উপায়গুলো বের কর।

পাঠ ৬ : সামাজিক বনায়নের নকশা বর্ণনা

সামাজিক বন

উদ্ভিদবান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য মানুষ পরিকল্পনা করে নিজস্ব চেষ্টায় এ বন তৈরি করে। বসতবাড়ি, প্রতিষ্ঠান, বাঁধ ও সড়ক, উপকূলীয় অঞ্চল, পাহাড়ি পতিত জমিতে সামাজিক বন সৃষ্টি করা হয়।

সড়ক ও বাঁধে সামাজিক বনায়ন

বাংলাদেশে সচরাচর সড়ক ও বাঁধে গাছ রোপণের জন্য একসারি ও দ্বি-সারি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সড়ক বা বাঁধের ঢাল অনুযায়ী সারির সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে।

একসারি পদ্ধতি

রাস্তা সরু হলে এ পদ্ধতিতে অনুসরণ করে গাছ লাগানো হয়। গাছ লাগানোর সময় একই ধরনের দুরত্ব অনুসরণ করা হয়।

দ্বি-সারি পদ্ধতি

রাস্তা বা বাঁধের ধার চওড়া হলে এ পদ্ধতিতে গাছ লাগানো হয়। গাছ লাগানোর সময় সঠিক নকশা অনুসরণ করা আবশ্যক।

সড়কের ধারে বৃক্ষরোপণ

বৃক্ষরোপণ কৌশল : এখানে গাছ লাগানোর স্থান অপর্যাপ্ত। তাই সরু লাইন করে গাছ লাগানো হয়। পাহাড়ি অঞ্চলে বনায়নের সময় সাধারণত ২ মিটার X ২ মিটার দুরে দুরে গাছ লাগানো হয়।

গাছ নির্বাচনে বিবেচ্য কৌশলসমূহ

যেসব গাছের পাতা ছোটো ও চিকন সেরকম গাছ লাগাতে হবে। রাস্তার ধারে বহুস্তরী বনায়ন করা ভালো, অর্থাৎ গাছের নিচে বিরুৎ বা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের সংমিশ্রণ দিয়ে বনায়ন করা দরকার। অন্যথায় মাঝারি বা ছোটো আকৃতির গাছ নির্বাচন করতে হবে।

গাছ লাগানোর কৌশল

১. যানবাহন ও জনগণের চলাচলের জন্য পাশে যে স্থান থাকে তাতে এক সারি গাছ লাগানো যেতে পারে। স্থানভেদে জমির প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে একাধিক সারি গাছ লাগানো যেতে পারে। যদি দুইসারি লাগানো হয় তবে ১.৫-২.৫ মিটার দূরে দূরে গাছ লাগানো যেতে পারে।

২. বাঁধের ধারে ঢালু অংশে সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগানো হয়। তবে এখানে প্রথম সারির একটি গাছ থেকে অন্য গাছের যে দূরত্ব তা ঠিক রেখে দুটি গাছের মধ্যবর্তী স্থান থেকে দ্বিতীয় লাইন শুরু করা বাঞ্ছনীয়।

৩. সড়কের নিচের অংশে এক সারিতে গাছ লাগানো হয়। মাটির যে অংশ নিচে তাতে মান্দার, জারুল, হিজল প্রভৃতি গাছ লাগানো হয়।

৪. প্রথম লাইন যেখান থেকে শুরু হবে, দ্বিতীয় লাইন তার বরাবর না হয়ে মধ্যবর্তী স্থান থেকে শুরু হবে। ফলে দুই মিটার দূরে দূরে গাছ লাগানো হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি চারা থেকে অন্য চারার দূরত্ব হবে ২ মিটার X ১ মিটার। এর ফলে মাটিক্ষয় রোধ করার ক্ষমতা বাড়বে। এতে বাঁধ নষ্ট হয় না।

গাছ নির্বাচন

১. বাঁধের দুইপাশে দ্বি-বীজপত্রী উঁচু ও বেশি শাখা-প্রশাখা সম্পন্ন গাছ লাগানো উচিত নয়। কারণ বেশি উঁচু গাছ হলে মাটির ক্ষয় বেশি হয়।

২. বেশি এলাকাজুড়ে মূল বা শিকড় থাকে এমন গাছ নির্বাচন করা উত্তম। যেমন– নারকেল, সুপারি প্রভৃতি এক-বীজপত্রী গাছ। এদের শিকড় বেশি এলাকা জুড়ে থাকে বলে মাটির ক্ষয় রোধ হয়।

৩. বাঁধের পাশে গাছ লাগানোর সময় যেসব গাছের পাতা গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়, সেসব গাছ নির্বাচন করা দরকার। কারণ বন্যার সময় এসব বাঁধ গৃহপালিত পশুর আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পাঠ ৭ : সড়ক ও বাঁধের ধারে বৃক্ষরোপণ পদ্ধতি বর্ণনা

সারিবদ্ধ বনায়ন

সড়ক ও বাঁধের ধারে কোথাও এক সারিতে, কোথাও দুই বা তিন সারিতে বনায়ন করা হয়ে থাকে। বৃক্ষরোপণের এ পদ্ধতিকে বলা হয় সারিবদ্ধ বনায়ন। সারিবদ্ধ বনায়ন বা স্ট্রিপ বনায়ন সামাজিক বনায়নের একটি উল্লেখযোগ্য উৎপাদন কৌশল। সারিবদ্ধ বনায়নে সাধারণত শিশু, আকাশমনি, অর্জুন, মেহগনি, জারুল, শিরীষ, রেইনট্রি, সোনালু, কৃষ্ণচূড়া, নিম প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করা হয়। বন বিভাগ ছাড়াও বিভিন্ন এনজিও বিশ্বস্বাস্থ্য কর্মসূচির সহায়তায় এবং নিজস্ব কর্মসূচির আলোকে সারাদেশে ব্যাপকভাবে সারিবদ্ধ বনায়ন সৃজন করেছে। ১৯৯০ সাল থেকে থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে সারিবদ্ধ বনায়ন পদ্ধতিতে বাগান সৃজন কর্মসূচি চালু আছে। সারিবদ্ধ বনায়নের প্রচলিত তিনটি মডেল হলো-

মডেল– ১. বড় সড়ক, রেল ও বাঁধ বনায়ন

মডেল– ২. সংযোগ সড়ক ও গ্রামীণ রাস্তা বনায়ন

মডেল– ৩. মহাসড়ক ও উঁচু রেলপথ বনায়ন

মডেল– ১-এর বর্ণনা

১। সড়ক/বাঁধের কিনারা থেকে ৩০ সে.মি. নিচে অড়হরের সারি থাকবে।

২। অড়হরের সারি থেকে ৩০ সে.মি. নিচে গাছের প্রথম সারি যাতে ২ মিটার ব্যবধানে বৃক্ষ রোপণ করা হবে।

৩। প্রথম সারি হতে ১.৫-২.৫ মিটার দূরে (ঢালের প্রস্থ অনুসারে) গাছের দ্বিতীয় সারি যাতে ২ মিটার ব্যবধানে গাছ লাগাতে হয়।

৪। সড়ক/বাঁধের ঢালের একেবারে নিচের প্রান্তে থাকবে ধৈঞ্চার সারি।

৫। সড়ক/বাঁধের ঢালের প্রশস্ততা ৩ মিটারের বেশি হলে ১.৫-২.৫ মিটার ব্যবধানে তিন কিংবা ততোধিক সারিতে গাছ লাগানো যেতে পারে।

৬। চারা লাগানোর ১৫ দিন আগে ৩০ সে.মি. × ৩০ সে.মি. × ৩০ সে.মি. গর্ত করতে হবে। প্রত্যেক গর্তে ১ কেজি গোবর, ২৫ গ্রাম টিএসপি, ২৫ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

৭। এ মডেলে ১ কিলোমিটারে সর্বমোট ১৬০০ চারা লাগানো যেতে পারে।

প্রজাতি নির্বাচন

প্রথম সারিতে শোভাবর্ধনকারী, ছায়া ও কাঠ উৎপাদনকারী গাছ লাগানো হয়। যেমন- মেহগনি, রেইনট্রি, শিশু, সেগুন, আম, কাঁঠাল, খেজুর, তাল ইত্যাদি। দ্বিতীয় সারিতে জ্বালানি ও খুঁটি প্রদানকারী দ্রুত বর্ধনশীল গাছ লাগানো হয়। যেমন-আকাশমণি, অর্জুন, বাবলা, শিশু, ইপিল ইপিল, রেইনট্রি ইত্যাদি।
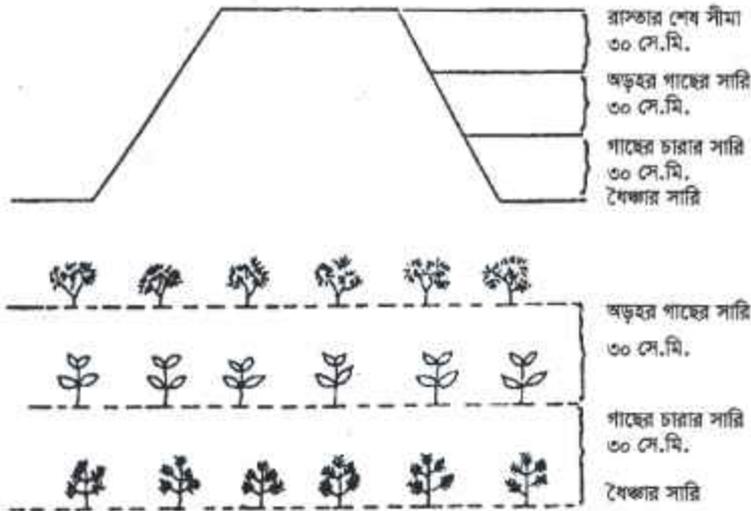
চিত্র : সড়ক ও বাঁধের ধারে এক সারিতে বৃক্ষরোপণ নকশা
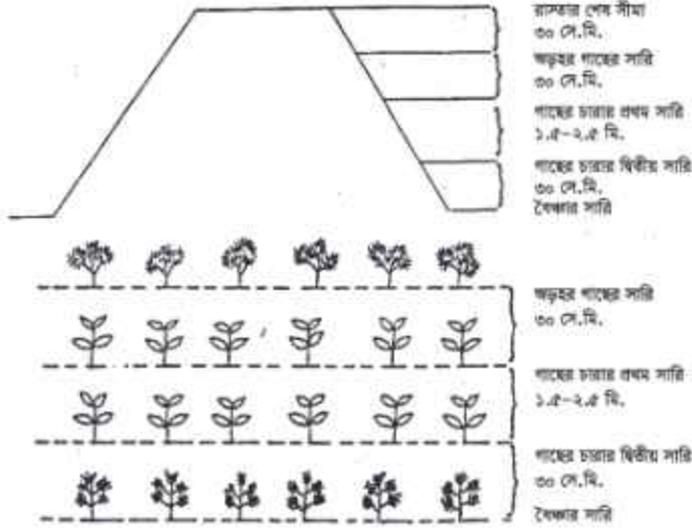
চিত্র : সড়ক ও বাঁধের ধারে দুই সারিতে বৃক্ষরোপণ নকশা

> **কাজ :** সড়ক ও বাঁধের ধারে দুই সারিতে বৃক্ষরোপণ নকশা দলগতভাবে পোস্টার কাগজে আঁক ও উপস্থাপন কর ।

পাঠ ৮ : সড়ক/বাঁধের ধার অথবা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ

স্থান নির্বাচন

সড়ক ও বাঁধের ধার অথবা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও এর আশপাশের সুবিধাজনক স্থান ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১ । কোদাল, খুন্তি, শাবল, ছুরি, গোবর, রাসায়নিক সার ইত্যাদি ।

২ । ব্যবহারিক খাতা, পেনসিল, কলম, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি ।

কাজের ধারা

১ । মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ হলে যেখানে গাছ রোপণ করবে তার আশপাশে যদি বড়ো গাছ থাকে তবে ডালপালা ছেঁটে নাও । সড়ক বা বাঁধের ধারে হলে এর প্রয়োজন নেই ।

২ । যে গাছ রোপণ করবে তার সতেজ চারা সংগ্রহ কর ।

৩ । সঠিক নিয়মে প্রয়োজনীয় মাপের গর্ত কর ।

৪। গর্তের মাটিতে গোবর ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে ভালোভাবে মাটি গুঁড়ো করে ১৫ দিন রোদে শুকিয়ে নেবে।

৫। মাটি আবার গর্তে ভরাট করে রাখ।

৬। চারার শিকড়ের সমপরিমাণ গর্ত কর।

৭। ছুরি দিয়ে চারাসহ পলিব্যাগের পলিথিন কেটে সরিয়ে ফেলো।

৮। মাটিসহ চারা গর্তে দিয়ে চারপাশের মাটি ভালো করে চেপে দাও।

৯। এবার পানি দাও।

১০। পরে প্রক্রিয়াটি ব্যবহারিক খাতায় লিখ। তোমার শক্ষককে দেখাও এবং খাতায় শিক্ষকের স্বাক্ষর নাও।

সড়ক ও বাঁধের ধারে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা

১। মাটিক্ষয় রোধ করে সড়ক ও বাঁধ রক্ষা করা।

২। পশুখাদ্য তৈরি করা।

৩। সড়ক ও বাঁধসংলগ্ন এলাকা সবুজায়ন করা।

৪। জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা।

৫। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬। পরিবেশে পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের আবাস সৃষ্টি করা।

৭। এলাকার পরিবেশ ঠান্ডা রাখা ও বৃষ্টিপাতের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৮। পরিবেশ সংরক্ষণ করা।

কাজ : দলগতভাবে সড়ক ও বাঁধের ধারে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয় পোস্টার তৈরি কর ও শ্রেণিতে প্রদর্শন কর।

বৃক্ষরোপণ করে
সড়ক ও বাঁধ
রক্ষা করব।

নমুনা পোস্টার-১

সড়কের পাশে
বৃক্ষরোপণ করে
মাটিক্ষয় রোধ করব।

নমুনা পোস্টার-২

সড়ক ও বাঁধের দুইপাশে
গাছ লাগাব পরিবেশকে
বাঁচাব।

নমুনা পোস্টার-৩

পাঠ ৯ : কৃষি বনায়নের নকশা প্রস্তুত ও বর্ণনা

একই ভূমিতে সুবিবেচিতভাবে বৃক্ষ, ফসল ও পশুখাদ্য উৎপাদন পদ্ধতিই হলো কৃষি বনায়ন। এতে একে অন্যের উৎপাদনকে ব্যাহত করে না। পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়। বাংলাদেশে সম্ভাব্য কৃষি বনায়নের যথেষ্ট উপযুক্ত স্থান রয়েছে। এগুলো হলো- বসত বাড়ির আঙিনা, কৃষিখামার, বসতবাড়ি সংলগ্ন জমি, পতিত ও প্রান্তিক জমি, ক্ষয়প্রাপ্ত ও নতুন করে সৃষ্ট বনাঞ্চল, সড়ক, রেলপথ ও বাঁধসংলগ্ন এলাকা, পুকুর ও জলাশয়ের পাড় এবং উপকূলীয় অঞ্চল।

সাধারণত সামাজিক কোনো নির্দিষ্ট এলাকার উপযুক্ত কৃষি বনায়ন মডেল বা নকশা তৈরিতে যেসব বিষয় বিবেচনা করতে হয়, তা হলো-

- ভূমির অবস্থান
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা
- মাটির বৈশিষ্ট্য
- কৃষকের চাহিদা

সম্ভাবনাময় কয়েকটি কৃষি বনায়ন মডেল বা নকশার বর্ণনা

১. **কৃষিভূমিতে ফসল ও বৃক্ষ চাষ :** এ ধরনের নকশায় একই জমিতে কৃষি ফসলের সাথে যৌথভাবে বৃক্ষের চাষ করা হয়।

ক) তুলনামূলকভাবে নিচু জমিতে নির্ধারিত দূরত্বে সারি করে গাছ লাগানো হয়। গাছের সারির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কৃষি ফসলের চাষ করা হয়।
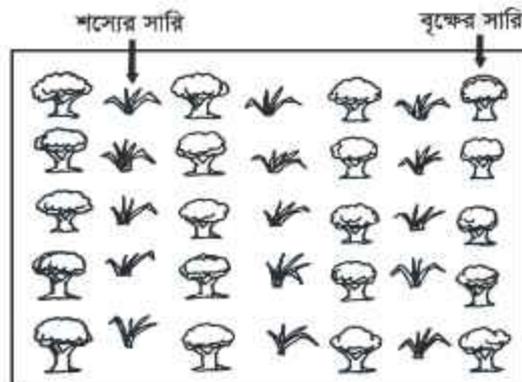
চিত্র : কৃষিজমিতে সারিবদ্ধ কৃষি বনায়ন

খ) কৃষি ফসলের প্রান্তসীমায় আইলের কাছে চারপাশে সারি করে গাছ লাগানো হয়।
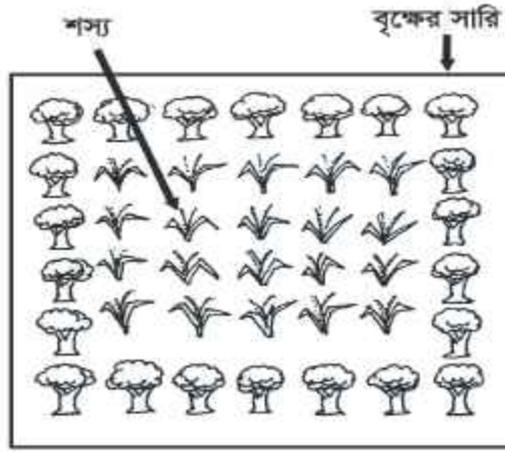
চিত্র : কৃষিজমির প্রান্তসীমায় বৃক্ষ চাষ

গ) এ ধরনের মডেল বা নকশায় কৃষকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃষিজমিতে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ বিক্ষিপ্তভাবে চাষ করে থাকেন।
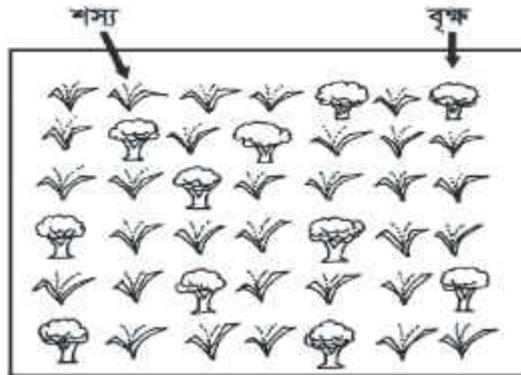
চিত্র : কৃষিজমিতে বিক্ষিপ্ত বৃক্ষ চাষ

২. অ্যালি ক্রপিং

কৃষি বনায়নের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এটি একটি সফল পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সাধারণত লিগিউম জাতীয় গুল্ম বা বৃক্ষ নির্দিষ্ট দূরত্বে ঘন সারিবদ্ধভাবে লাগানো হয়। দুই সারির মাঝে কৃষিজ ফসলের চাষ করা হয়।
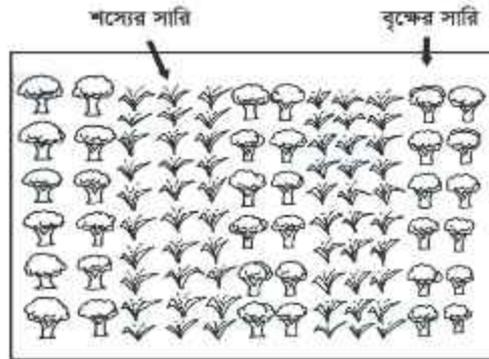
চিত্র : গুল্ম বা বৃক্ষ ও শস্য চাষ

৩. ফসল, বৃক্ষ ও পশুপালন

এ পদ্ধতিতে ফলদ বা বনজ বৃক্ষের নিচে একবর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী কৃষি ফসল ও পশুপালন করা হয়।
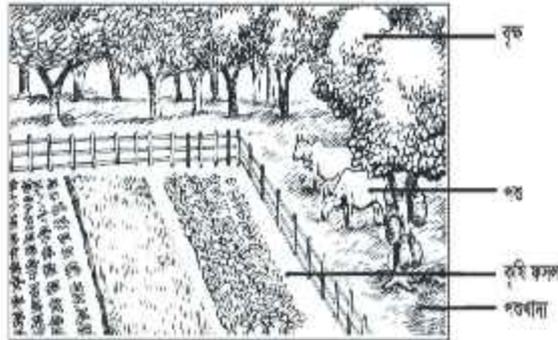
চিত্র : ফসল, বৃক্ষ ও পশুপালন

৪. মৎস্য, বৃক্ষ ও ফসল

এ পদ্ধতিতে মাছ চাষের সাথে সাথে পুকুরের ঢালু পাড়ে মাচার মাধ্যমে লতাজাতীয় শাকসবজি লাগানো হয়। পানির প্রান্তসীমায় বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ এবং উঁচু পাড়ে ফলদ বৃক্ষ চাষ করা হয়।
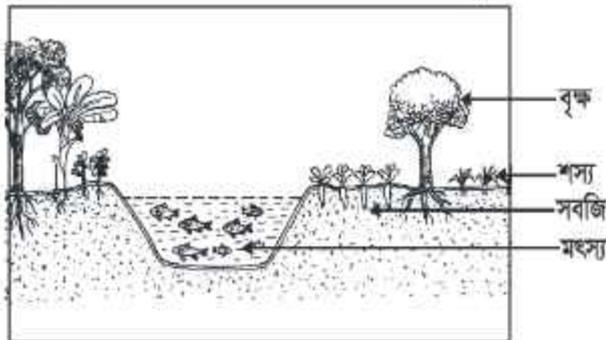
চিত্র : মৎস্য, বৃক্ষ ও ফসল

৫. বসতবাড়িতে কৃষি বনায়ন

এ পদ্ধতিতে শাকসবজি, খাদ্য, ফসল, গবাদিপশু, হাঁস মুরগি এবং বিভিন্ন ধরনের বনজ, ফলদ ও শোভাবর্ধনকারী গাছপালা একসাথে উৎপাদিত হয়।
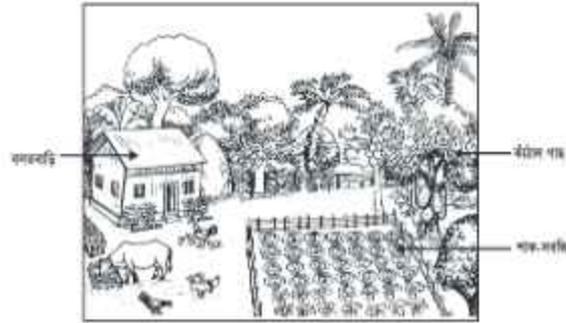
চিত্র : বসতবাড়িতে কৃষি বনায়ন

> **কাজ :** তোমার এলাকায় কী ধরনের কৃষি বনায়ন করা সম্ভব দলীয়ভাবে তার একটি করে নকশা পোস্টার পেপারে আঁক এবং উপস্থাপন কর।

পাঠ ১০ : মিশ্র বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা

মিশ্র বৃক্ষ চাষ

মিশ্র বৃক্ষ চাষ এক ধরনের বনায়ন ব্যবস্থা। বনায়নের এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকমের বৃক্ষের সমন্বিত চাষ হয়ে থাকে। মিশ্র বৃক্ষ চাষে একই জমিতে ফলদ, বনজ ও ঔষধি উদ্ভিদের চাষ করা হয়। কখনো কখনো এসব বৃক্ষের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম ফসলি শস্যের চাষও হয়ে থাকে। অনেক সময় মিশ্র উদ্ভিদের সাথে পশুপাখি ও মৎস্য চাষও করা হয়। বাড়ির চারদিকে, খেলার মাঠের চারদিকে, বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, ফসলি জমি, নদী, খাল ও পুকুরপাড় প্রভৃতি স্থানে মিশ্র উদ্ভিদ চাষ করা সম্ভব।
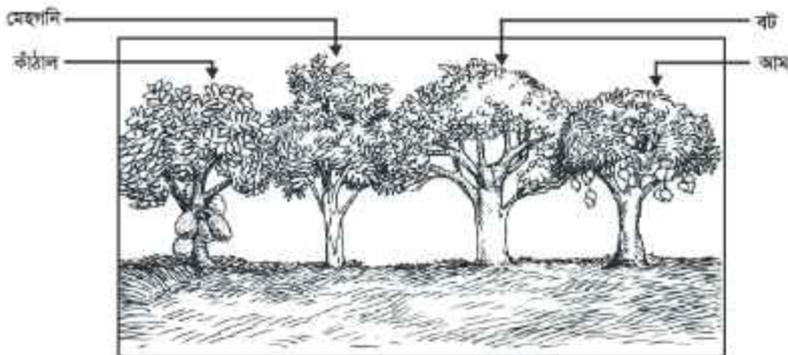
চিত্র : মিশ্র উদ্ভিদ চাষ

মিশ্র উদ্ভিদ চাষের এলাকা নির্বাচন

মাঝারি নিচু ও নিচু এলাকা

যেসব গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে সেসব গাছ নিচু এলাকায় লাগানো যেতে পারে। যেমন- হিজল, রয়না, জারুল, করচ, মান্দার, কড়ই ইত্যাদি উদ্ভিদ নিচু এলাকায় রোপণ করা হয়। হাওর, বিল ও পার্শ্ববর্তী নিচু এলাকায় এসব উদ্ভিদ রোপণ করা হয়।

মাঝারি উঁচু ও উঁচু এলাকা

এসব এলাকা সব রকম গাছ লাগানোর জন্য উপযোগী। আম, কাঁঠাল, তাল, খেজুর, মেহগনি, শাল, সেগুন, বেল, কদবেল, আমলকী, বহেরা, হরীতকী প্রভৃতি উদ্ভিদের মিশ্র বৃক্ষ চাষ এসব এলাকায় হয়ে থাকে। বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর প্রভৃতি এলাকায় এসব উদ্ভিদের চাষ হয়ে থাকে। এলাকাভিত্তিক শিমুল, কার্পাস, আনারস, কমলা, কলা প্রভৃতি ফসলি উদ্ভিদ ও মিশ্র বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে চাষ করা হয়।

কাজ
নিচের কাজ দুটি দলগতভাবে উপস্থাপন কর

১. তোমাদের এলাকায় কী কী মিশ্র বৃক্ষ চাষ করা যায় পোস্টার পেপারে তার একটি তালিকা তৈরি কর।
২. তোমাদের এলাকায় মিশ্র বৃক্ষরোপণ না করে শুধু বনজ উদ্ভিদের চাষ করলে কী কী অসুবিধা হবে তা উলেখ কর।

মিশ্র বৃক্ষ চাষের প্রয়োজনীয়তা

১. এলাকাভিত্তিক বৃক্ষরোপণের প্রজাতি নির্বাচন করা যায়।

২. এলাকায় বসবাসকারী জনগণের সব রকম চাহিদা মেটানো যায়।

৩. জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়।

৪. পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের আবাস সৃষ্টি হয় এবং খাদ্যের চাহিদা মেটে।

৫. পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।

৬. গ্রামীণ জনসাধারণের কাজের ক্ষেত্র বাড়ে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে, ফলে দারিদ্র্য বিমোচন হয়।

৭. জ্বালানি, পুষ্টি, খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজনে এ বন ভূমিকা রাখে।

৮. পরিবেশ ঠান্ডা থাকে, বৃষ্টিপাত হয়।

৯. ভূমিক্ষয় ও ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কাজ : মিশ্র বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত নিচের ছকটি পূরণ কর।

খাদ্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদ	বস্ত্র উৎপাদনকারী উদ্ভিদ	বাসস্থান নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনকারী উদ্ভিদ	আসবাব তৈরির উপাদান উৎপাদনকারী উদ্ভিদ	ঔষধি উদ্ভিদ
১. ২.	১. ২.	১. ২.	১. ২.	১. ২.

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাঁধের কিনারা থেকে ৩০ সে.মি. দূরে সারি আকারে কোনটি লাগানো হয়?

ক. অড়হর খ. বৃক্ষ

গ. শস্য ঘ. ধৈঞ্চা

২. কৃষি বনায়নের সমস্যাগুলো হচ্ছে-

i. জনগণের অংশীদারিত্বে অনীহা

ii. প্রয়োজনীয় জমির অভাব

iii. প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

আশিকুর রহমান একটি এনজিওতে চাকরি করেন। তিনি গ্রামের পাকা রাস্তার ধারে দুই কিলোমিটারে বৃক্ষরোপণের দায়িত্ব পান। তিনি সেগুন বৃক্ষের পাশাপাশি অন্যান্য গাছ রোপণের পরিকল্পনা করলেন।

৩. আশিকুর রহমানের কতটি সেগুন চারা প্রয়োজন?

ক. ৮০০ খ. ১৬০০
গ. ২৪০০ ঘ. ৩২০০

৪. আশিকুর রহমানের পরিকল্পনা অন্যান্য উদ্ভিদের উপর কী প্রভাব ফেলবে?

ক. অন্যান্য উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ বেশি হবে খ. ছোট ছোট উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হবে
গ. জমিতে ফসলের উৎপাদন কম হবে ঘ. মাটিস্থ অনুজীবের বৃদ্ধি ব্যাহত হবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আতিকুর রহমানের বসবাসের বাড়ির আয়তন ১ একর। তার বসতবাড়ির আঙিনায় একটি পুকুর, কিছু পরিমাণ উঁচু পতিত জমি রয়েছে। কিন্তু কোনো কৃষিজমি নেই। সন্তানদের লেখাপড়া ও সাংসারিক খরচ চালাতে তিনি সমস্যায় পড়েন। অতঃপর আতিকুর রহমান দুটি গাভী ও বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষের চারা ক্রয় করে সেগুলো থেকে উৎপাদনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করলেন।

ক. কৃষি বনায়ন কী?

খ. মিশ্র বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. আতিকুর রহমানের বাড়ির আঙিনার প্রেক্ষাপটে একটি কৃষি বনায়নের নকশা বর্ণনা কর।

ঘ. আতিকুর রহমানের সংসারের আর্থিক উন্নয়নে তার কার্যক্রম বিশ্লেষণ কর।

২. আলোকদিয়া দাখিল মাদ্রাসার পাশ ঘেঁষে বড়ো একটি খাল বয়ে গেছে। মাদ্রাসার সুপার খালের পাড়সংলগ্ন মাদ্রাসার আঙিনায় সামাজিক বনায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করলেন। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে বিভিন্ন জাতের গাছ রোপণ করে সামাজিক বনায়নে সফল হলো। সামাজিক বনায়নে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক বিভিন্ন পোস্টার তৈরি করে র‍্যালির উদ্যোগ গ্রহণ করল।

ক. নার্সারি কী?

খ. গাছ কীভাবে পরিবেশকে ঠান্ডা রাখে? ব্যাখ্যা কর।

গ. শিক্ষার্থীদের কার্যক্রমের সফলতার কৌশল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. এলাকার জনগণের সচেতনতা সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের উদ্যোগটি মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল অষ্টম–কৃষিশিক্ষা

সুন্দর আচরণই পুণ্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।